ছোটদের বিশ্বনবী

মোশাররফ হোসেন খান

ছোটদের বিশ্বনবী

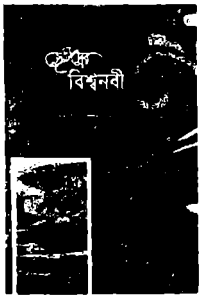

মোশাররফ হোসেন খান

খেয়া প্রকাশনী

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

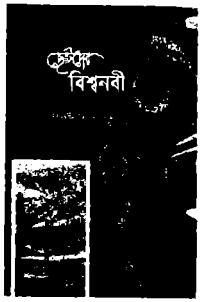

ছোটদের বিশ্বনবী

মোশাররফ হোসেন খান

খে. প্র-১৬

প্রকাশক

রাইদা তাসনীম

খেয়া প্রকাশনী

প্রকাশনায়

খেয়া প্রকাশনী

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ২০১৩

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা

ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

মূল্য

একশত বিশ টাকা মাত্র

www.amarboi.org

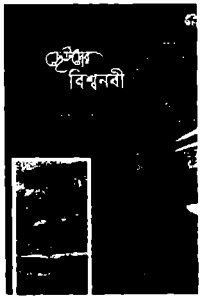

সূচিপত্র

- ❖ মহানায়কের আগমন ৫
- ❖ বরফ পানিতে ধোয়া পবিত্র কলিজা ১৩
- ❖ মহান শিক্ষক ১৭
- ❖ রাসূল মুহাম্মাদ (সা) ধবল জোছনার সম্রাট ২৫
- ❖ রাসূল (সা) আমার পরশমণি ৩৭
- ❖ জীর্ণ ঘরে জোছনার হাসি ৪৫
- ❖ গুহার ভেতর অবাক পুরুষ ৫২
- ❖ তায়েফের পথে আলোর পথিক ৬১
- ❖ হাসে দরিয়ার দুই কূল ৬৬
- ❖ আলোর খোঁজে বহুদূর ৭৩
- ❖ আলোর মিছিল ৮৩
- ❖ বিস্ময়কর বিজয় ৯৩
- ❖ অবাক সেনাপতি ১০৭
- ❖ যে পরশে জেগেছে প্রাণ ১২০
- ❖ আলোর মিছিলে ১২৪

www.amarboi.org

মহানায়কের আগমন

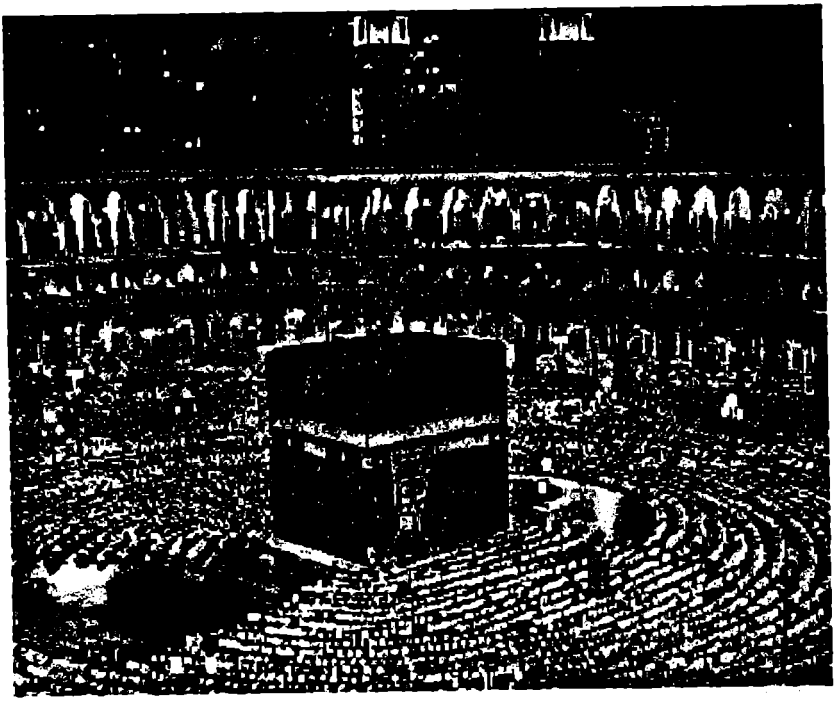

মা আমিনা!

কেন জানি দারুণ খুশি আজ।

খুশির বাঁধ ভেঙেছে আজ।

আকাশেও মেঘ কেটে গেছে!

চাঁদের আলোয় চারপাশ জোছনাপ্লাবিত।

নক্ষত্রের চোখে-মুখে জ্যোতির ফুয়ারা!

মা আমিনা।

তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে।

চাঁদের দিকে।

www.amarboi.org

জোছনার দিকে।

তারার দিকে।

রাতজাগা পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে তাঁর

মাথার ওপর দিয়ে।

তাদের ঠোঁটেও অবাক করা ভাষা!

তাদের ডানায় আলোর পরশ!

নীরব রাত।

তবু যেন কিসের শব্দ!

সে এক আশ্চর্য ধ্বনি!

কিসের ধ্বনি!

কিসের শব্দ!

সচকিত হয়ে ওঠেন মা আমিনা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখেন অবাক দৃষ্টিতে।

না!–

কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল মেঘমুক্ত

আকাশ ছাড়া!

কেবল চাঁদ ও জোছনা ছাড়া।

তবে কিসের শব্দ!

কিসের ফিসফিসানি!–

মা আমিনা আরও গভীরভাবে, আরও মগ্ন

হয়ে যান ঐ শব্দের দিকে।

তিনি শুনতে চান।–

হ্যাঁ, কে যেন এক আগন্তুক!

তাঁর চেহারা কেমন ধবধবে জোছনার মতো।

বিকেলের রোদের মতো।

www.amarboi.org

ঢেউ টলোমল পদ্মপুকুরের মতো।

তিনি, হ্যাঁ তিনিই তো বলছেন মা আমিনাকে।

মা আমিনা এবার তাঁর কথার দিকে মনোযোগী হলেন।

কি বলছেন!

আগন্তুক বললেন, মা, মাগো!–

হ্যাঁ! বলুন!–

মা আমিনার যেন আর তর সইছে না।

তিনি কান পেতে আছেন তাঁর কথার দিকে।

বলুন!

কোনো ভূমিকা ছাড়াই আগন্তুক বললেন–

'মাগো! আপনার গর্ভে যে শিশু– তিনি শিশু নন।

তিনি মহানায়ক!

তিনি এই যুগের মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক।

আলোকরশ্মি!'

মা আমিনা!

কথাগুলো শুনেই তাঁর বুকের ভেতরটা বঙ্গোপসাগরের মতো দুলে উঠলো।
বসন্তের হাওয়ার মতো দোল খেল হৃদয়ের চাতাল।

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি বললেন!

আগন্তুক বললেন, হ্যাঁ মা, আপনার গর্ভের শিশুই হবেন এক আশ্চর্য
মহানায়ক।

মহানায়ক!

মানব জাতির পথপ্রদর্শক!

পরশ পাথর!

আমার শিশু! যে এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি!

মা আমিনার দু'চোখে নেমে এসেছে খুশি ও আনন্দের বন্যা!

www.amarboi.org

সত্যিই তাই!-

মা আমিনা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন।

আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

সত্যিই তিনি আপনার মাধ্যমে আসছেন

এবং তিনিই হবেন শেষ জমানার পথহারা

মানুষের জন্য পথের দিশারি।

তিনিই হবেন আলোর সম্রাট।

তিনিই হবেন জগৎ শ্রেষ্ঠ।

এক অতুলনীয় মহানায়ক।

মা আমিনা থরো থরো কম্পমান!

না, ভয়ে নয়।

দুশ্চিন্তায় নয়।

সে কেবল আনন্দে।

সে কেবল আবেগে।

ভাবছেন মা আমিনা। আমি কতই না সৌভাগ্যবতী মা! আমিই হবো সেই মহানায়কের জননী!

আহ! এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কিইবা আছে!

আগন্তুক বললেন, 'মা, মাগো!'

বলুন।

'আপনার সেই মহানায়ক যখন ভূমিষ্ঠ হবেন, তখনই আপনি বলবেন :

"সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে এই শিশুকে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি এবং তাঁর নাম রাখবেন- মুহাম্মাদ।"

মা আমিনা তখনো কাঁপছেন।

তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে জেগে উঠলো এক আশ্চর্য শিহরণ।

আগন্তুক চলে গেলেন।

এরপর এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন।

www.amarboi.org

কি চমৎকার স্বপ্ন!

স্বপ্ন নয়, যেন সত্যিই!

তিনি দেখলেন, তাঁর ভেতর থেকে এমন এক আলোকরশ্মি বেরিয়ে এলো, যে আলো দিয়ে মা আমিনা সিরিয়া ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদসমূহ দেখতে পেলেন।

দিন যায়।

সময় যায়।

কি এক দারুণ আশ্চর্য শিহরণে কাটতে থাকে মা আমিনার প্রহরগুলো!

তখনও আসেননি ধরার বুকে মহানায়ক!

তখনও নামেনি আলোর বন্যা!

তবুও তাঁর আগমনের খবরটা ঠিকই ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

তাঁর আগমনবার্তা ধ্বনিত হচ্ছে আকাশে-বাতাসে।

ছড়িয়ে পড়ছে মক্কার ছোট্ট কুটির থেকে মরুভূমি ছাড়িয়ে অন্যপ্রান্তে। অনেক দেশে।

কে আসছেন!

কার ঘরে!

কবে!

সে এক দারুণ সাড়া পড়ে গেল।

দেশে দেশে।

আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞ এক বাদশাহর কাছে ছুটে গেল তিনজন ব্যক্তি।

জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই কি 'মুহাম্মাদ' নামে কোনো নবীর আগমন ঘটতে যাচ্ছে?

বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ। তিনি আসছেন।

খুব সহসাই জন্মগ্রহণ করবেন সেই মহানায়ক নবী। ধবল জোছনার সম্রাট।

বাদশাহর কথা শুনেই তারা ছুটে গেলেন যার যার বাড়িতে।

www.amarboi.org

তারাও পিতা হতে যাচ্ছেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, আর যদি সে হয় পুত্র, তবে তার নাম রাখা হবে 'মুহাম্মাদ'।

কারণ এমন এক মহানায়কের পিতা হওয়া কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়!

তারাও হতে চান এমনি গর্বিত পিতা।

যেই সিদ্ধান্ত, সেই কাজ।

তাদের তিনজনের ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো এবং তাদের নামও রাখা হলো মুহাম্মাদ!

তখনও মহানায়কের আবির্ভাব ঘটেনি।

তাঁর আগমনের পূর্বেই তাঁরই নামানুসারে যে তিনজনের 'মুহাম্মাদ' নাম রাখা হয়েছিল, তারা হলেন– কবি ফারজদাকের দাদার দাদা মুহাম্মাদ ইবন সুফিয়ান বিন মুজাশি, মুহাম্মাদ ইবন উহাইয়া ইবনে আল জাল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হিমরান ইবনে রাবিয়াহ।

কিন্তু না, তারা কেউ পারলো না সেই মহানায়কের গর্বিত পিতা হতে।

সাধারণত এমনিই আওয়াজ শোনা যায় দুনিয়ার রাজদরবারে :

'সাবধান! হুঁশিয়ার! বাদশা নামদার আসছেন!'

না!

মহানায়ক আগমনকালে এমন কোনো হুঁশিয়ারি শব্দ উচ্চারিত হয়নি।

বরং চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল খুশি ও আনন্দের এক মহোৎসব।

কবি হাসসান ইবনে সাবিত।

যিনি ছিলেন মহানায়কের চেয়ে আট বছরের বড়।

তিনি বলছেন সেই আনন্দঘন মুহূর্তের কথা।

বলছেন মহানায়কের আগমনপূর্ব সেই টান টান সময়ের কথা।

সাবিত বলছেন, আমি হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক ইহুদি ইয়াসরিবের (মদিনার) একটি দুর্গের ওপর উঠে উচ্চস্বরে বলছে– 'হে ইহুদি সমাজ।' ... সাথে সাথে তার চারপাশে জমে গেলো মানুষের ভিড়। সে তাদেরকে

www.amarboi.org

বললো, 'আজ রাতে আহমদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।'

হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

সেই রাতেই উদিত হলো সেই বহু প্রতীক্ষিত এক বিরল নক্ষত্র।

অবশেষে এলেন তিনি।

তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎ উজারা করে মা আমিনার কোল জুড়ে, পিতা আবদুল্লাহর জীর্ণ কুটিরে। এসেছেন!– মহানায়ক এসেছেন!

এসেছেন শেষ জমানার দিশাহারা, পথহারা মানুষের পথপ্রদর্শক এসেছেন।

তিনিই মহানবী (সা)!

তিনিই শ্রেষ্ঠতম সম্রাট!

তিনিই জগতের আলোর দিশারি!

সময়টি ছিলো আবরাহা তার হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবা অভিযানের মাত্র বার দিন পর।

দিনটি ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল।

মহানায়ক এলেন বটে!

কিন্তু তার আগেই ইন্তিকাল করলেন পিতা আবদুল্লাহ!

তিনি দেখে যেতে পারলেন না তাঁর প্রাণপ্রিয় জগৎ ধন্য পুত্রকে।

দেখে যেতে পারলেন না তাঁর চোখজুড়ানো আলোর সম্রাটকে।

কি এক বেদনার বিষয়!

মহানায়ক ভূমিষ্ঠ হলেই মা আমিনা পুত্রের দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে সেই বহু প্রতীক্ষিত খুশির খবরটি জানিয়ে দিলেন।

বললেন, আসুন, দেখুন আব্বা!

আপনার এক পৌত্র এসেছে ঘর আলোকিত করে!

খবরটি শুনে দাদা আবদুল মুত্তালিব ছুটে গেলেন।

দেখলেন জগৎ সেরা মহানায়ককে।

মা আমিনা তাঁকে জানালেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগের সকল কথা। জানালেন তাঁর নাম কি হবে– সেটাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে– তার কথা।

www.amarboi.org

দাদা শুনলেন সকল কথা তারপর নয়নের মণিকে বুকে ঝাপটে ধরে ছুটলেন কাবা ঘরের দিকে।–

তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন।

তারপর আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন।...

দাদার বুকেও খুশির ঢল।

তিনি পৌত্রকে কাবাঘর থেকে নিয়ে এসে আবার তুলে দিলেন মা আমিনার কোলে।

মহানবী এসেছেন!

এসেছেন মহানায়ক!

শুধু মা আমিনার কুটির নয়, দ্রুত খুব দ্রুত সুসংবাদটি ছড়িয়ে পড়লো মক্কাসহ আরবের বিস্তৃত প্রান্তরে।

তাঁর আগমনে বাতাসে ভেসে বেড়ালো ফুলেল সুরভি।

প্রতিটি প্রাণী এবং বস্তুই আল্লাহর শুকরিয়ায় নতজানু হয়ে পড়লো।

গোটা পৃথিবীর বুকেই জেগে উঠলো খুশির শিহরণ।

আলোর জোয়ারে ভরে উঠলো গোটা পৃথিবী।■

www.amarboi.org

বরফ পানিতে ধোয়া
পবিত্র কলিজা

রাসূল মুহাম্মাদ (সা)!

প্রাণপ্রিয় নবী।

মানুষ ও মানবতার মুক্তির দূত। আলোর দিশারি।

আমাদের প্রাণপ্রিয় এই নবীকে (সা) একবার আলোর পাখিরা– অর্থাৎ কিছু সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে দয়ার নবীজী! আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন। আমরা শুনতে চাই। আমরা শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে।

শুনে তৃষিত প্রাণ জুড়াতে চাই।

নবী (সা) একটু মুচকি হাসলেন!

www.amarboi.org

তারপর বললেন, শোনো, আমি পিতা ইবরাহীমের (আ) দোয়ার ফল। আর ভাই ঈসার (আ) সুসংবাদের পরিণতি।

তারপর! তারপর!–

সাহাবীগণ ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন, তারপর! তাহলে শোনো– আমি তখন মায়ের গর্ভে। আমার মা– সৌভাগ্যবতী মা আমিনা সেই সময়, হ্যাঁ ঠিক সময় স্বপ্নে দেখেন, তাঁর মধ্য থেকে একটা জ্যোতি বেরুলো এবং যে জ্যোতির আলোকচ্ছটার সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেল।

আর তোমরা তো জানই, শৈশবে আমি দুধ মা হালিমার গৃহে লালিত পালিত হই।

এই সময়, একদিন আমার এক দুধ ভাইয়ের সাথে বাড়ির পেছনে মেষ চরাতে যাই।

আমরা দুই ভাই এক মনে মেষ চরাচ্ছি।

ঠিক এমনি সময় দু'জন লোক আমার কাছে এলেন। তাঁদের পরনে ছিলো ধবধবে সাদা কাপড়। তাঁদের কাছে ছিলো একটা সোনার তশতরি।

তশতরি ভর্তি বরফ।

আমি তো দেখেই অবাক!

তারপর!–

সাহাবাগণ উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন,

তারপর!–

তারপর তাঁরা আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন।

এরপর আমার পেট চিরলেন।

আমার হৃৎপিণ্ড বের করে সেটাও চিরলেন।

হৃৎপিণ্ডের ভেতর ছিলো একফোঁটা কালো জমাট রক্ত।

সেই কালো রক্তের ফোঁটাটি বের করে তাঁরা ফেলে দিলেন। তারপর তশতরি ভরা বরফের পানি দিয়ে আমার পেট ও হৃৎপিণ্ড ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর আবার ঠিক ঠিক ভাবে লাগিয়ে দিলেন।

www.amarboi.org

কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, আমার পেট চিরা হলো, হৃৎপিণ্ড চিরে কলিজা বের করে আনা হলো, আবার তা পরিষ্কার করে ঢুকানো হলো– কিন্তু আমি এতটুকুও ব্যথা বা কষ্ট পেলাম না! যেন কিছু বুঝতেই পারলাম না! তাঁদের কাজ শেষ হলে একজন অপরজনকে বললেন, 'মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর উম্মতের দশজনের সাথে ওজন করো।

তিনি আমাকে পরিমাপ করলেন।

কী আশ্চর্য!

আমি দশজনের চেয়েও ওজনে বেশি হলাম!

এবার বললেন, মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর উম্মতের একশ জনের সাথে ওজন করো। অপরজন নির্দেশ মতো তাই করলেন।

আমি এবারও একশ জনের চেয়ে ওজনে বেশি হলাম!

তারপর আমাকে এক হাজার জনের সাথে ওজন করা হলো।

কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

সেই এক হাজার জনের চেয়েও আমি ওজনে বেশি হলাম।

এরপর প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বললেন, আর নয়। এবার রেখে দাও। আল্লাহর কসম!

তাঁকে যদি তাঁর সমগ্র উম্মতের সাথেও ওজন করা হয়, তাহলেও তিনিই হবেন সবার চেয়ে ওজনে বেশি।

অবাক করা বিষয় বটে! কিন্তু সেটাই সত্যি।

কেন হবে না!

দয়ার নবীজীর (সা) সমতুল্য আর কিইবা আছে!

আর কিইবা হতে পারে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে!

তিনিই তো জগৎ সেরা মহামানব!

তিনিই তো আলোর জ্যোতি কুলের অধিক।

রাসূলের (সা) বক্ষ বিদারণের এই ঘটনা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্নতো জাগতেই পারে!–

কেন এই বক্ষ বিদারণ?

www.amarboi.org

কেন তাঁর পেট ও কলিজা সাফ?

বিষয়টি ভাবনা জাগায়।

চিন্তার দুয়ার খুলে দেয়।

ফেরেশতার মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীবকে (সা) একেবারেই পূত-পবিত্র করে নিলেন।

যেন তার মধ্যে কোনো মন্দের চিহ্নমাত্র না থাকে।

একেবারে পবিত্র, একেবারেই খাঁটি মহামানব হিসেবে রাসূল (সা) যেন তাঁর উম্মতকে আলোর পথ দেখাতে পারেন– সেই জন্যই তো ছিলো এই আয়োজন!

রাসূল (সা) আমার খাঁটি সোনা।

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

রাসূল আমার আলোর অধিক।

প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) আমার!

ফুলের সুবাসের চেয়েও অধিক সুবাসিত তিনি। তিনিই আমাদের মহান নেতা। তিনিই আমাদের পথের দিশারি। শিক্ষকের শিক্ষক। মহান শিক্ষক। তিনিই আমাদের প্রাণের প্রাণ। একেবারে আত্মার আত্মীয়।

আমাদের কী সৌভাগ্য!

আমরা তাঁরই উম্মত।

সুতরাং তাঁর পথ অনুসরণ করলেই আমরা পেয়ে যাবো সোনালি সফলতা।

তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে চললেই আমরা পৌঁছুতেই পারবো আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য– মানজিলে।

এসো, রাসূলকে (সা) ভালোবাসি মনে-প্রাণে।

এসো, রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করি।

এসো, আমরা চলি রাসূলের (সা) দেখানো সেই আলোর পথে।

সুন্দরের পথে–

কল্যাণের পথে।■

www.amarboi.org

মহান শিক্ষক

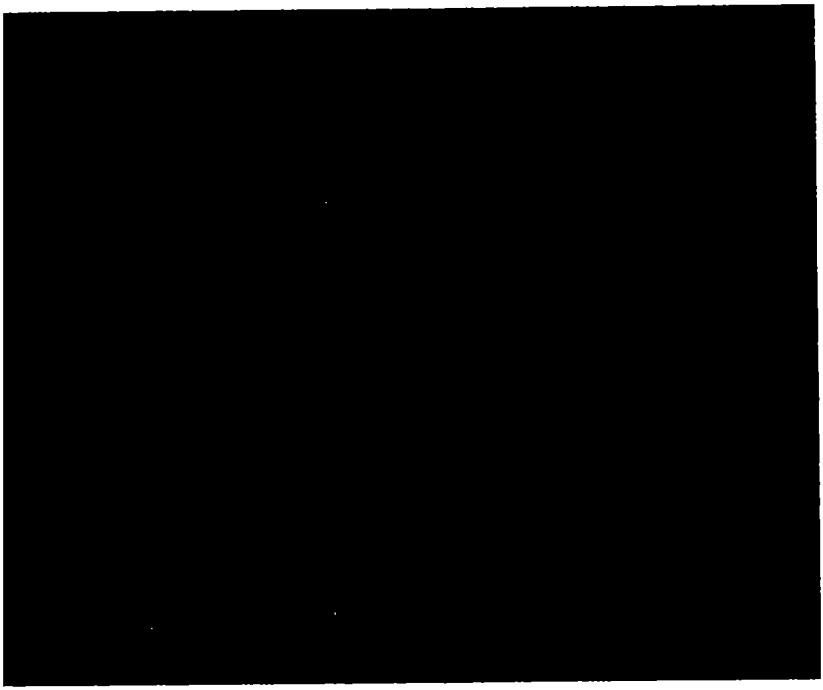

নবী মুহাম্মাদ (সা)।

মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামানব।

নবীদের (আ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী।

আলোর নবী। জ্যোতির পরশ।

সকল গুণের সমাহারে এক অতুলনীয় পরশ পাথর।

তিনি শিক্ষকের শিক্ষক। মহান শিক্ষক।

তাঁর মতো দরদী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক তাঁর আগেও কেউ আসেননি, পরেও না। আগামীতেও আসবেন না আর তেমন শিক্ষক।

কেমন করে আসবেন?

রাসূলই (সা) তো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ শিক্ষক।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন রাসূলের (সা) শিক্ষার দায়িত্ব। একেবারে সরাসরি।

আল্লাহর দেয়া শিক্ষায় তিনি ছিলেন শিক্ষিত। সেই শিক্ষাতেই হয়েছিলেন আলোকিত। হয়েছিলেন উদ্ভাসিত। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন–

"হে নবী, আপনাকে আমি এমন সব জ্ঞান দান করেছি– যা আপনিও জানতেন না এবং আপনার পূর্ব পুরুষও জানতো না।"

সত্যিই তাই।

রাসূল (সা) আল্লাহপ্রাপ্ত সেই জ্ঞান কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি।

তিনি তাঁর শিক্ষা এবং জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুলেছিলেন গোটা জাতিকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন যে আরব– যে আরবের ফোকর গলিয়ে আলো প্রবেশের কোনো সুযোগই ছিলো না– সেই অন্ধ জাতির ঘরে ঘরে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন শিক্ষার আলোক প্রদীপ।

কেন করবে না?

তিনি তো নিজেই বলছেন–

"আমি মানুষ ও মানবতার জন্য শিক্ষকরূপে জগতে প্রেরিত হয়েছি।"

সুতরাং এ থেকেই তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহানবী (সা) সমগ্র মানুষকে শিক্ষার আলোয় উদ্দীপ্ত করার জন্যই গোটা জীবন সচেষ্ট ছিলেন।

নিয়েছিলেন যুগান্তকারী কতো না সাহসী পদক্ষেপ!

দয়ার নবীজী (সা) নিরক্ষরতা কিংবা মূর্খতা কখনই পছন্দ করতেন না।

তাঁর বুকে সকল সময় বেলের কাঁটার মতো বিদ্ধ হতো নিরক্ষরতার কষ্ট।

কেন মানুষ মূর্খ থাকবে?

কেন মানুষ নিরক্ষর থাকবে?

কেন মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে?

মানুষ তো এসেছে জগতকে আলোকিত করার জন্য।

এই পৃথিবীকে উর্বর করা জন্য।

www.amarboi.org

মানবতার ফুলে-ফসলে ভরে তোলার জন্য।

নিরক্ষর কিংবা মূর্খ মানুষের পক্ষে কি সেটা কখনো সম্ভব?

কক্ষনো নয়।

ভাবেন দয়ার নবীজী (সা)।

ভাবেন আর তার কর্মকৌশল কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

কিভাবে মানুষকে জ্ঞানে ও শিক্ষায় উন্নতি করা যায়!

কিভাবে তাদেরকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা যায়!

কিভাবে তাদের মধ্যে বিশ্বাস, চিন্তা এবং কর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়।

না, শিক্ষা ছাড়া এর কোনো বিকল্প পথ নেই। রাস্তা নেই। দরোজা নেই। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত এবং আলোকিত করতে পারলেই তো জাতি আলোকিত হয়।

আর জাতি আলোকিত হওয়া মানেই তো দেশ, মহাদেশ এবং গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠা।

রাসূল (সা) এটা খুব ভালোভাবেই বুঝলেন যে, শিক্ষাই হলো সকল কিছুর মূল।

সকল কিছুর চেয়ে অনেক দামি– একমাত্র শিক্ষা।

শিক্ষার অভাবেই তো মানুষ ভুল করে। বেপথু হয়। অন্যায় করে। কতো না পাপের মধ্যে জড়িয়ে যায়।

সুতরাং তাদের মুক্তির একমাত্র পথ হলো– শিক্ষা।

শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। থাকতে পারে না।

রাসূল (সা) খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন এটা।

তাই তিনি গ্রহণ করলেন এবার বাস্তব পদক্ষেপ।

সেটা ছিলো এমন এক বিরল পদক্ষেপ– যা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আর কেউ তেমনটি করতে পারেননি।

সেই ছিলো এক অভিনব মডেল!

ইতিহাসে এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই।

www.amarboi.org

সেটা কী?

বদর যুদ্ধ!

বদর যুদ্ধ মানেই তো ঐতিহাসিক যুদ্ধ!

এই যুদ্ধের মহান সেনাপতি ছিলেন রাসূল (সা)।

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয় করলেন।

পরাজিত হলো আল্লাহর দুশমনরা।

তাদের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো অনেকেই।

সংখ্যায় সত্তরজন।

তারা ছিলো যেমনি নেতৃস্থানীয় তেমনি শিক্ষিত।

রাসূল (সা) ভাবলেন– এই তো চমৎকার সুযোগ!

তিনি রক্তের বদলা না নিয়ে তাদেরকে মুক্তিপণের শর্ত দিলেন।

সেই শর্তটি ছিলো অভিনব এক শর্ত।

তাদেরকে বলা হলো– তোমরা বন্দি। ইচ্ছা করলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে পারতাম।

রক্তের বদলা নিতে পারতাম।

কিন্তু না, আমরা সেটা করিনি।

করবোও না।

বরং আমরা তোমাদেরকে মুক্তি দিতে চাই।

তোমাদের মুক্তির জন্য শর্ত হলো– তোমরা প্রত্যেকেই দশজন নিরক্ষর মানুষকে লেখাপড়া করাবে।

তাদের লিখতে শেখাবে। পড়তে শেখাবে।

শিক্ষার প্রকৃত জ্ঞানে তাদেরকে আলোকিত করে তুলবে।

যদি সেটা পারো, তাহলে তোমাদের দায়িত্ব পালন শেষেই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

বন্দীদের চোখে-মুখে বিস্ময়!–

এ কেমন মুক্তিপণ?

www.amarboi.org

রক্ত নয়, অর্থ নয়, সম্পদ নয়, রাজ্য নয়– অক্ষরজ্ঞান দেয়া!

লেখা-পড়া শেখানো!

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা!

রাসূলের (সা) প্রস্তাবে তারা অবাক হয়ে গেল।

খুশিতে ডগমগ করে উঠলো তাদের চোখ।

ভয়ঙ্কর, কঠিন কোনো শাস্তি নয়– বরং এটা তো পুরস্কার!

এ কেমন মুক্তিপণ!

রাসূলের (সা) প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার বৃষ্টি ঝরতে থাকলো মুষল ধারায়।

তারা একবাক্যে সহাস্যে রাজি হয়ে গেল।

বললো, আমরা প্রস্তুত। প্রস্তুত এমনি একটি মহৎ কাজের জন্য। এতে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

সুযোগ যখন এলো, তখন তিনি সেটা কাজে লাগালেন।

যুদ্ধবন্দী চরম দুশমনদেরকে তিনি শিক্ষকের মতো বিশাল মর্যাদা দিয়ে মদীনায় পাঠালেন।

সত্তরজন বন্দি প্রত্যেকেই দশজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবার কাজে লেগে গেল।–

শুরু হয়ে গেল রাসূল (সা) প্রবর্তিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী।

বন্দীদেরকে শিক্ষক হিসেবে মদীনায় নিযুক্ত করেই নবীজী (সা) ক্ষান্ত হলেন না।

গোটা আরব জাতির সামনে তিনি একের পর এক তুলে ধরলেন শিক্ষামূল আলোর বাতি।

তিনি আল কুরআনের আয়াত তুলে ধরেন আরবের মূর্খ, বর্বর এবং অসভ্য জাতির সামনে।

উদ্দেশ্য তো একটাই– তাদেরকে শিক্ষিত করে সভ্য জাতিতে পরিণত করা গোটা আরব জাতিকে।

www.amarboi.org

রাসূল (সা) জাতির সামনে আল কুরআনের ভাষ্য তুলে ধরলেন–

"যাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।"

তিনি আবারও শোনালেন তাদেরকে আল্লাহর বাণী–

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞানী, আল্লাহ পাক তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করে দেবেন।"

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আরব জাতির মুক্তির জন্য রাসূল (সা) নিজেই 'দারুল আরকাম' পরিচালনা করেন। তিনি নিজেই সেটা তত্ত্বাবধান করতেন।

যেটা ছিলো ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে।

ইতিহাসে এটিই ছিলো বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং রাসূল (সা) পরিচালিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মদীনায় আবু উসামা ইবন যুবাইয়ের (রা) বাড়িতেও রাসূল (সা) একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসয়াব ইবন উমাইরকে (রা) রাসূল (সা) এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

রাসূলের (সা) দেয়া শিক্ষানীতি ও দর্শনের আলোকে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে থাকে।

রাসূলের (সা) হিজরতের পর মদীনার বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেন।

মদীনায় প্রতিষ্ঠিত এটাই প্রথম দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মদীনার দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত করেন আবু আইউব আনসারীর (রা) নিজস্ব বাসভবনে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাসূল (সা) নিজেই দীর্ঘ আটটি বছর যাবৎ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

নিরক্ষরতা দূর করার জন্য, মানুষকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাসূল (সা) মসজিদভিত্তিক আবাসিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন।

www.amarboi.org

হিজরী দ্বিতীয় সনে রাসূল (সা) আরও একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

এর নাম ছিলো– 'দারুল কোবরা'।

এভাবে, হ্যাঁ ঠিক এভাবেই রাসূল (সা) যখন যেখানে যেমন অবস্থানেই ছিলেন– তখন সেখানেই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রাসূলের (সা) আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবায়ে কিরামরাও (রা) একইভাবে শিক্ষা বিস্তারে রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

আমরাও পারি।–

নিশ্চয়ই পারি– আমাদের চারপাশের শিক্ষাবঞ্চিত নিরক্ষর মানুষের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলতে।

আমরাও যদি রাসূলের (সা) শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি, আদর্শ ও বাস্তব কর্মকৌশল গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাই, তাহলে দেখা যাবে আমাদের চারপাশে আর কেউ নিরক্ষর মানুষ নেই।

প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তির।

প্রয়োজন শুধু উদ্যোগের।

ব্যাস্! এইটুকু হলেই আমরা পরিকল্পিতভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

আমার চারপাশের মানুষকে যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, যদি তাদেরকে যথাযথ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারি– তাহলে দেখবো ভালো মানুষের সংখ্যা কতগুণে বেড়ে গেছে!

কতগুণে বেড়ে গেছে আলোকিত মানুষ!

সৎ, জ্ঞানী এবং শিক্ষিত মানুষ বেড়ে গেলে তখন বন্ধুর সংখ্যাও তো বেড়ে যাবে।

কমে আসবে শত্রুর সংখ্যা।

কমে আসবে হিংসা, হিংস্রতা, বিদ্বেষ এবং খারাপের পরিমাণ।

আর তখন আমাদের এই চারপাশ, আমাদের এই সমাজ, আমাদের সবুজ-সুন্দর দেশটি হয়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার দেশ।

www.amarboi.org

সোনার মানুষ ছাড়া কি সোনালি দেশের স্বপ্ন দেখা যায়?

যায় না।

তাইতো নিজের ভালোর জন্য, দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে রাসূলের (সা) আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে হবে।

এটা কারা করবে?

আমরাই।

এসো, কারোর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই শুরু করে দেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের মহৎ কাজটি।

প্রথমে পরিবারের কাজের লোক থেকে শুরু করা যায়।

তারপর প্রতিবেশী, মহল্লা, গ্রাম এবং অন্যত্র– সকল জায়গায়।

কেন পারবো না?

রাসূল (সা) পেরেছেন। তিনিই তো পথ দেখিয়ে গেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) পেরেছেন।

পরবর্তীতে তারই ধারাবাহিকতা ও আদর্শে পেরেছেন পৃথিবীর বহুমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি।

যারা পেরেছেন– তাঁরা মহৎ হতে পেরেছেন। বড় হতে পেরেছেন।

সুতরাং আমরা কেন পারবো না!

ইনশাআল্লাহ পারবো।

এসো, হাতে হাত ধরে রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করে কঠিন প্রত্যয়ে গন্তব্য ঠিক করে নিই।

তারপর দৃঢ়তার সাথে, সাহসের সাথে পা বাড়াই।

কল্যাণের দিকে।

ক্রমাগত সামনের দিকে।■

www.amarboi.org

রাসূল মুহাম্মাদ (সা)
ধবল জোছনার সম্রাট

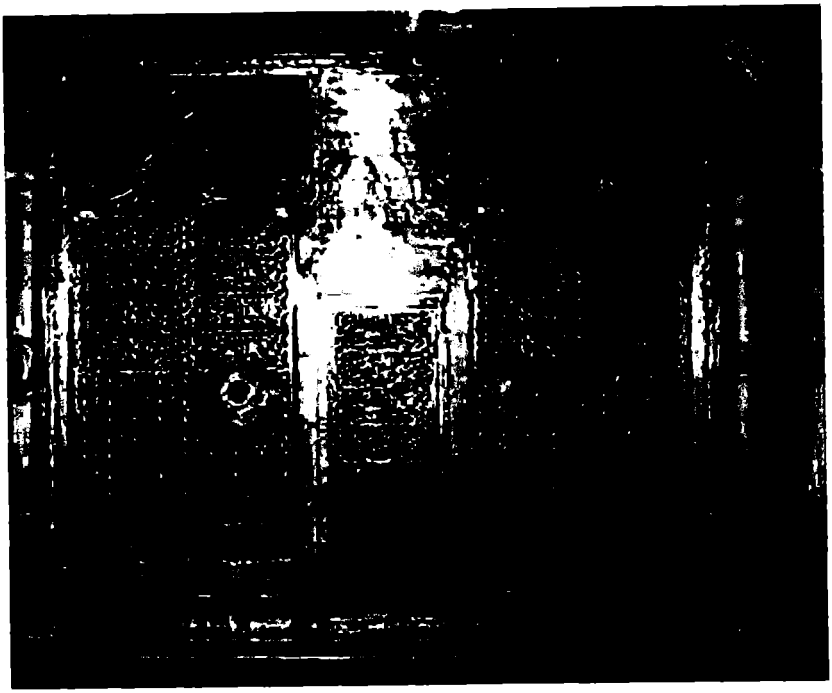

চারদিকে থক থক করছে গভীর আঁধার।
মানুষের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই, নেই এতটুকু স্বপ্ন কিংবা ভরসাস্থল।
গোটা বিশ্বই যেন কম্পমান!
দারুণ অসহায়!
ঠিক এমনি সময়ে লক্ষ আঁধার ভেদ করে পৃথিবীর বুকে সীমাহীন আলোর জ্যোতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন আমাদের প্রিয়নবী রাসূল মুহাম্মাদ (সা)।

www.amarboi.org

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)!

আমাদের প্রিয় নবী।

জগতের সেরা সৃষ্টি।

সেরা মানুষ।

আলোর জ্যোতি!

রাসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেন মরুভূমির

দেশ আরবের মক্কা নগরে।

সময়টি ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই রবিউল আউয়াল।

রাসূলের (সা) আগমন সম্পর্কে আল্লাহ পাক আল কুরআনে বলেন,

'সৃষ্টি জগতের রহমতস্বরূপ তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছি।'

সূরা আল আহযাবে আরও বলা হয়েছে :

'হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও একটি উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে পাঠিয়েছি।'

সত্যিই প্রদীপসম ছিলেন দয়ার নবীজী (সা)!

তাঁর আলোকে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

কেমন সব ফকফকা, উজ্জ্বল।

নবীজীর (সা) বংশের নাম কুরাইশ।

গোত্রের নাম বনী হাশিম।

পরিবারের নাম- মুত্তালিব।

আব্বার নাম- আবদুল্লাহ।

আম্মার নাম- আমিনা।

দাদার নাম- আবদুল মুত্তালিব। আর নানার নাম- ওয়াহাব।

আবদুল মুত্তালিবের পরিবারটি ছিল কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খান্দান ও শরীফ।

তার সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল প্রচুর।

www.amarboi.org

নবীজীর চাচা ছিলেন যথাক্রমে- হারিস, আবুল ওজ্জা (আবু লাহাব), আবু তালিব, দিরার, আব্বাস, মুকাওবীম, জ্বহল, হামযা ও জোবাইর।

আর তাঁর ফুফু ছিলেন– আতিকাহ, উমাইমা, আরওয়া, বাররা, উম্মে হাকীম ও সফিয়্যাহ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দুধমাতা ছিলেন কানিজ ছওবিয়া ও হালিমা ছা'দিয়া।

দয়ার নবীজীর শৈশবকালটি ছিল একেবারেই অন্যরকম। সবার থেকে আলাদা।

তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করলেন আব্বা।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-মা হালিমার কাছে তিনি প্রতিপালিত হন। পরবর্তী ছয় মাস আম্মার কাছে।

ছয় বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন আম্মা। পরবর্তী দুই বছর দাদার কাছে প্রতিপালিত হন। আট বছর বয়সে দাদা ইন্তেকাল করেন।

দাদার ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন রাসূল মুহাম্মাদ (সা)।

বার বছর বয়সে দয়ার নবীজী (সা) চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে দুঃসাহসী যুবক- নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন যুবকের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন মজলুম মানবতার মুক্তিকামী প্রথম সংগঠন 'হিলফুল ফুজুল'।

এটা ছিল তাঁর মানবাধিকার উচ্চকিত করার এক বিরল নিদর্শন।

'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনের শপথ ছিল পাঁচটি। যেমন :

১. নিঃস্ব, অসহায়, দুর্গতদের সেবা করবো।

২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেব।

৩. মজলুমকে সাহায্য করবো।

৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবো।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।

www.amarboi.org

সত্যিকার অর্থে আজকের দিনের জন্যও এই পাঁচটি শপথ আমাদের সকলের জন্য সমান জরুরি।

মুহাম্মাদ (সা) সেই যৌবন বয়সেই 'নূর' পাহাড়ের হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এই হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হলো :

'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক।'

– পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আয়াতটি শোনার সাথে সাথেই অভিভূত হয়ে গেলেন দয়ার নবীজী!

তিনি বাড়ি এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তখনও তিনি সমান কম্পমান!

ঠিক এই সময় আবার নাযিল হলো :

'হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি!

ওঠো, লোকদেরকে সাবধান করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো।'

এরপর রাসূল (সা) ছাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের ডাকলেন,

'ইয়া সাবাহা....!'

রাসূলের (সা) সেই সঙ্কেত শুনে ছুটে এলো মক্কাবাসী।

তাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা) বললেন :

"হে ধ্বংস পথের যাত্রীদল!

হুঁশিয়ার হও। এখনো সময় আছে।

এখনো পথ আছে।

এক আল্লাহর ইবাদত করো।

অন্তরকে সুন্দর করো।

তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

রাসূলের (সা) প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে ঈমান আনলেন মাত্র আটজন।

www.amarboi.org

তাঁরা হলেন : প্রথম মহিলা- স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা; প্রথম কিশোর- হযরত আলী (রা), প্রথম ক্রীতদাস- জাইদ (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), উম্মে আইমান, আমর বিন আম্বাছা (রা), বিলাল (রা) ও খালিদ বিন সা'দ (রা)।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা।

এরপর একে একে আরও কিছু মহিলা ইসলাম কবুল করলেন।

যেমন- আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাজল (রা), আনিসের কন্যা-আসমা (রা), হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) ও হযরত উমরের বোন ফাতিমা (রা)।

খাদিজা (রা) যেমন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, তেমনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা)।

তিনি ইসলামের দ্বিতীয় শহীদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন।

হযরত ফাতেমার (রা) অক্লান্ত ও নির্ভীক প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর ভাই উমর। এই দুঃসাহসী উমরই (রা) ছিলেন রাসূলের (সা) ওফাতের পর আমাদের দ্বিতীয় খলীফা।

সময় এলো আবিসিনিয়ায় হিজরাতের।

এটাই প্রথম হিজরাত।

এই প্রথম হিজরাতে প্রথম দলের সাথে ছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা।

তাঁরা হলেন–

রুকাইয়া (রা), সালমা বিনতে সুহাইল (রা), উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া (রা), লায়লা বিনতে আবি হাশমাহ (রা)।

রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই সময়ের বেশ কিছু চিন্তাশীল সত্যানুরাগী মানুষ, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষ এবং লাঞ্ছিতা নারী।

www.amarboi.org

নবীজীর কণ্ঠ যত ছড়িয়ে পড়লো, ইসলামের আহ্বান যত জোরদার হলো- ততোই সত্যের সাহসী মানুষের ওপর পাপিষ্ঠদের অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল।

ইসলামের সত্যের আওয়াজকে মুছে ফেলার জন্য কাফের-মুশরিকরা শুরু করলো সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও হামলা।

তাদের নির্যাতন ও অত্যাচারে প্রথম দিকেই একে একে শহীদ হলেন- হারিস ইবনে আবিহালা (রা), সুমাইয়া (রা), ইয়াসির (রা) ও খোবাইব (রা)।

আর চরমভাবে নির্যাতিত হলেন- আম্মার (রা), খাব্বাব (রা), জোবাইর (রা), বিলাল (রা), সোহাইব (রা), আবু ফকীহা (রা), লুবাইনা (রা), যুনাইয়া (রা) ও নাহদিয়া (রা)।

নবুওয়তের ষষ্ঠ বছর।

এই সময়েই ঘটে গেল এক ঐতিহাসিক প্রথম মিছিল!

ছাফা থেকে মুসলমানদের একটি মিছিল বের হয় রাসূলের (সা) নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরে।

মিছিলের দুই সারির সামনে ছিলেন হামযা (রা) ও উমর ফারুক (রা)।

উভয়ের মাঝে ছিলেন মহান সেনাপতি রাসূল (সা)।

সবার কণ্ঠে ছিল- 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি।

এই ঐতিহাসিক প্রথম মিছিলটি শেষ হয় কাবায় গিয়ে।

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে মুসলমানরা সামাজিক বয়কটের শিকার হন।

মক্কার সকল গোত্রে বনী হাশিম গোত্রের সাথে আত্মীয়তা, কেনা-বেচা, খাদ্য বিনিময়সহ সকল প্রকার লেন-দেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মুসলমানরা শিআবে আবি তালিব নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময় তাঁরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্য দিয়ে এক চরমতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

মুসলমানদের ওপরে এই দুঃসহ অবরোধ চলে টানা তিনটি বছর।

www.amarboi.org

তবুও হতাশ হননি রাসূল (সা)।

ভেঙে পড়েননি একজন মুসলমানও।

এই কঠিনতম পরীক্ষায় পাস করলেন রাসূল (সা) সহ সত্যের সাহসী সৈনিকরা। নবী (সা) এবার মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে, তায়েফে গেলেন দীনের দাওয়াত নিয়ে।

সেখানে তিনি ক্রমাগত দশদিন দাওয়াতী অভিযান চালান।

কিন্তু তায়েফবাসীরা রাসূলের (সা) দাওয়াত গ্রহণ করলো না। বরং তাদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত হলেন দয়ার নবীজী (সা)।

তবুও থেমে থাকলো না রাসূলের (সা) দীনের দাওয়াতী অভিযান।

দাওয়াতের ব্যাপারে রাসূলের (সা) ক্রমাগত চেষ্টা ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রার ফলেই তো এক সময় সেই তায়েফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

নবুওয়তের দশম বছর।

এই সময় মানবতার মুক্তির দিশারি নবী মুহাম্মাদ (সা) মিরাজে গমন করেন।

মিরাজের শিক্ষাই ছিলো ইসলামী সমাজ গঠনের একটি প্রাথমিক নীল নকশা।

মিরাজ থেকে ফিরে চৌদ্দটি বুনিয়াদি শিক্ষার সাথে রাসূল (সা) আমাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। এগুলো হলো :

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করো না

২. আব্বা-আম্মার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করো

৩. অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় এবং মুসাফিরদের হক আদায় করো

৪. সম্পদের অপচয় করো না

৫. মিতব্যয়ী হও

৬. রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন

৭. অভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করো না

৮. ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না

www.amarboi.org

৯. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না

১০. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করো না

১১. ওয়াদা ও চুক্তিনামা ভঙ্গ করো না

১২. সঠিকভাবে মাপ ও ওজন করো

১৩. আন্দাজ-অনুমানের বশবর্তী হয়ো না

১৪. অহমিকা বর্জন করো

কি চমৎকার শিক্ষা!

সুন্দর ও সফল জীবন গঠনের জন্য এর প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দনীয় ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য মক্কার পরিবেশ দিন দিনই প্রতিকূলে যেতে লাগলো।

অন্যদিকে মদীনা ছিলো ইসলামের জন্য একটি উর্বর ভূমি।

রাসূল (সা) আল্লাহর নির্দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মদীনায় হিজরতের।

হযরত আবু বকরকে (রা) সাথে নিয়ে বহু চড়াই-উৎরাই ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে তিনি পৌঁছুলেন মদীনায়।

রাসূলের (সা) এই হিজরতের সময় থেকেই 'হিজরী' সাল গণনা শুরু হয়।

৮ই রবিউল আউয়াল।

মদীনা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে রাসূল (সা) উপস্থিত হলেন।

এই কুবা পল্লীতে রাসূল (সা) ছিলেন চৌদ্দ দিন।

এখানেই তিনি স্থাপন করেন মসজিদে কুবা।

কুবাই হলো মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এই কুবা মসজিদেই প্রথম সালাতুল জুমআ অনুষ্ঠিত হয়।

কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থানের পর রাসূল (সা) আবার যাত্রা শুরু করলেন মদীনার দিকে।

রাসূল (সা) মদীনায় যাচ্ছেন। পেছনে রয়েছে পড়ে তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমি মক্কা।

মক্কা!

www.amarboi.org

মক্কা রাসূলের (সা) জন্মভূমি!

প্রাণপ্রিয় স্বদেশ!

কিন্তু সেই মক্কার দুর্ভাগ্য মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে চিনতে পারলো না!

তাঁকে কষ্ট দিল নিদারুণভাবে।

মক্কা!

প্রিয় জন্মভূমি মক্কা!

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে একদিনের জন্যও যেখানে রাসূল (সা) থাকতে পারেননি শান্তিতে।

প্রতি পদে পদে যেখানে তিনি পেয়েছেন কষ্ট আর লাঞ্ছনা।

তবুও সেই মক্কার জন্য প্রাণটা কাঁদছে রাসূলের (সা)।

তিনি বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন। আর দেখে নিচ্ছেন ধূসর-ধূসরতম তাঁর প্রিয় জন্মভূমিটি। সামনেই মদীনা।–

মদীনার পরিবেশ মক্কার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেখানে বয়ে যাচ্ছে কোমল বাতাস।

শিরশির শীতল হাওয়া।

রাসূল (সা) আসছেন!

আসছেন আলোকের সভাপতি!

ধবল জোছনার সম্রাট!

মুহূর্তেই খবরটি ছড়িয়ে গেল মদীনার ঘরে ঘরে।

মদীনার উপকণ্ঠে মানুষের ভিড়।

নীল আকাশে পাখির ওড়াউড়ি।

কিচিরমিচির মধুর কলরব।

হৃদয়ে তাদের তৃষ্ণার মরুভূমি।–

কখন আসবেন রাসূল (সা)?

কখন!

www.amarboi.org

প্রতীক্ষার পালা শেষ।

এক সময় মদীনায় পৌঁছুলেন রাসূল (সা)। রাসূলের (সা) জন্য মদীনাবাসীরা আয়োজন করলেন সংবর্ধনার।

সে কি মনোরম দৃশ্য!

সে কি অভাবনীয় ব্যাপার!

রাসূল (সা) আসছেন!–

তাঁর আগমনে শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে :

"তালাআল বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল বিদাঈ
ওয়াজাবাশ শুকরা আলাইনা
মাদাআ লিল্লাহি দাঈ।"

রাসূল (সা) এসেছেন মদীনায়!

মদীনার ঘরে ঘরে আজ খুশির ঢল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে পেয়ে তারা খুশিতে বাগ বাগ।

আনন্দে আত্মহারা!

রাসূল (সা) এসেছেন!

মদীনায়, প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) এসেছেন!

মুহূর্তেই মদীনার আকাশ-বাতাস মথিত করে ছুটে চললো আনন্দের এক অপার্থিব জ্যোতির্ময় সূর্য!...

মুহূর্তেই! রাসূল (সা) আমাদের প্রাণের প্রাণ।

সকল প্রেম ও ভালোবাসা কেবল তাঁর জন্যই।

তাঁর জন্যই আমাদের দরূদ ও সালাম।

তিনি সকল সৃষ্টির সেরা।

আলোর দিশারি।

জগৎ উজালা।

www.amarboi.org

তিনিই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

এজন্যই তো আমরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠি :

"সব মানুষের সেরা মানুষ
সব মানুষের সেরা
তাঁরই প্রেমে ব্যাকুল ধরা
তাঁরই প্রেমে ঘেরা।
তাঁর প্রেমে যে সুধা কতো
গন্ধ বিলায় অবিরত
হীরার চেয়ে দামি সে যে
লক্ষ আঁধার চেরা।
বিশ্বটাকে আপন করে
তাঁর মতো কে নিতে পারে
তাঁর মতো কে ছুঁতে পারে
সাত সাগরের ডেরা?
ফুল শাখাতে ফুলের দোলা
দিচ্ছে কে যে দোল
রাসূল-প্রেমে আজকে ও মন
আপনারে তুই ভোল।
রাসূল নামে মুক্তো ঝরে
তাঁর নামে যে হৃদয় ভরে
ঐ নামে যে হৃদয় পাগল
সকল নামের সেরা
হীরার চেয়ে দামি সে যে
লক্ষ আঁধার চেরা।"

www.amarboi.org

সত্যিই তাই!

প্রাণ-প্রিয় রাসূল (সা) লক্ষ আঁধার চিরেই

আমাদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন এক আলোকিত বিশ্ব।

আমরা সেই ঝলমল আলোকিত বিশ্বেরই মানুষ।

তাঁরই অনুসারী।

অতএব তাঁর পথই হতে হবে আমাদের পথ।

তাঁর আদর্শের আলোকেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের গোটা জীবন।

তাহলেই সার্থক হবো আমরা। তাহলেই সার্থক হবে রাসূলের (সা) প্রতি আমাদের সকল ভালোবাসা। আমরা যেন রাসূলের (সা) গুণে ও আদর্শে সত্যিকার সৎ, যোগ্য এবং মহৎ– আদর্শবান মানুষ হিসেবেই গড়ে উঠতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।■

www.amarboi.org

রাসূল (সা) আমার পরশমণি

পৃথিবীর সেরা এক মানুষ– নবী মুহাম্মাদ (সা)। আমাদের প্রিয় নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব। রাসূলের (সা) প্রতিটি বিষয়ই আমাদের কাছে অশেষ জ্ঞানের সাগর।

আলোর দীপ্তি। রাসূল (সা) ছিলেন একজন ব্যস্ত রাষ্ট্রনায়ক, কৌশলী সেনাপতি, সমাজ ও পরিবারের প্রতি আন্তরিক। যেমন ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, তেমনি ছিলেন আবার কোমল বন্ধু।

কী অপরিসীম ধৈর্য, সাহস আর দৃঢ়তার প্রতীক ছিলেন দয়ার নবীজী!

পাহাড় সমান গুরুদায়িত্ব আর সাগর সমান চিন্তার মধ্যেও তিনি মানুষের সাথে মিশতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন প্রাণ খুলে।

আবার কখনো বা নির্দোষ হাসি-তামাশাও করতেন শত উৎকণ্ঠার মধ্যেও।

www.amarboi.org

রাসূলের (সা) ব্যবহারে রুক্ষতা ছিলো না। ছিলো না কঠিন, খটখটে পাথরকণার মতো।

তাঁর কথা ছিলো এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী শীতল যে, যে শুনতো, তারই ভরে উঠতো হৃদয়-মন।

বুকে শিহরণ জাগাতো এক অন্য রকমের।

আবার এই শ্রেষ্ঠ মানুষটি কখনো বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। পরিবেশের প্রতি খেয়াল রাখতেন সব সময়।

কখন কোন কথা বলার প্রয়োজন, তিনি সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝতেন।

হযরত যায়িদ বিন ছাবিত বলেন, 'যখন আমরা দুনিয়াবি বিষয়ে আলোচনা করতাম, তখন রাসূল (সা) তাতে অংশগ্রহণ করতেন। যখন আমরা আখেরাতের বিষয়ে কথা বলতাম, তখন তিনি তাতে অংশ নিতেন। যখন আমরা খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলতাম, তখন রাসূল (সা) তাতেও অংশগ্রহণ করতেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাসূল (সা) কসম খেয়ে বলেছেন, আমার মুখ দিয়ে সত্য ও উচিত কথা ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।

আল কুরআনও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তিনি মনগড়া কিছু বলেন না।

কথা বলাও একটা আর্ট। কথা দিয়েই তো প্রথমত মানুষকে আকৃষ্ট করতে হয়।

সেই কথা যদি হয় এলোমেলো কিংবা অর্থহীন, তাহলে তার আর কীইবা গুরুত্ব থাকে? রাসূল (সা) আমাদের জন্য রেখে গেছেন কথা বলার এক চমৎকার মডেল।

তাঁর কাছ থেকেই আমরা কথা বলার টেকনিকটা আয়ত্ত করতে পারি।

রাসূল (সা) কথা বলতেন ধীরে ধীরে। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন প্রতিটি শব্দ।

উচ্চারণে কোনো রকম জড়তা ও অস্পষ্টতা ছিলো না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, শ্রোতারা তা সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারতো। তাদের হৃদয়ে গেঁথে যেত রাসূলের প্রতিটি শব্দ।

www.amarboi.org

উম্মে মা'বাদ বলেছেন, 'তার কথা যেন মুক্তোর মালা।' কী চমৎকার উপমা!– 'মুক্তোর মালা।' আসলেই তো তাই! কেন হবে না? তিনি প্রয়োজনের বেশি কথা বলতেন না।

আবার প্রয়োজনের কমও না। যাকে বলে মাপা কথা।

রাসূল (সা) কখনো অশোভন, অশ্লীল ও রুচিহীন কথা বলতেন না।

এগুলোকে তিনি খুবই ঘৃণা করতেন। আবার কথা বলার সময় তাঁর মুখে দেখা যেত মুক্তোর ঝিলিকের মতো মিষ্টি হাসির রেখা।

বিস্ময়করই বটে! প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিলো না। তবু এই শ্রেষ্ঠ মহামানুষটি ছিলেন আরবের সর্বাপেক্ষা সুভাষী।

তিনি আয়ত্ত করেছিলেন আরবের সবচেয়ে নির্ভুল ভাষা, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অহির মধুর ভাষা।

তাঁর ভাষার সাহিত্যিক মান যেমন উৎকৃষ্ট ছিলো, তেমনি ছিলো তা সরল ও সহজবোধ্য। রাসূল (সা) নিজেই নতুন নতুন উপমা, বাগধারা, উদাহরণ প্রভৃতি তৈরি করতেন। একবার বনু নাহদ গোত্রের কয়েকজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর এই চমৎকার ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে।

জবাবে রাসূল (সা) বললেন : 'আল্লাহ স্বয়ং আমাকে ভাষা ও সাহিত্য শিখিয়েছেন, তাই সর্বোত্তম ভাষাই শিখিয়েছেন।

তাছাড়া আমি বনু সা'দ গোত্রে পালিত হয়েছি। এটাই এর রহস্য।

হযরত উমরও (রা) একবার বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে রাসূল! আপনি তো কখনো আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকেননি, তবু আপনি আমাদের সবার চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন কীভাবে?

জবাবে রাসূল (সা) বললেন, 'আমার ভাষা ইসমাঈলের (আ) ভাষা।

ওটা আমি বিশেষভাবে শিখেছি। জিবরাঈল (আ) এ ভাষাই আমার কাছে নিয়ে এসেছেন এবং আমার হৃদয়ে তা বদ্ধমূল করেছেন।'

রাসূল (সা) ব্যবহার করতেন সংক্ষিপ্ত বাক্য। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে থাকতো গভীর অর্থ ও তাৎপর্য।

কয়েকটি নমুনার সাথে আমরা পরিচিত হই।

www.amarboi.org

যেমন :

- ❖ মানুষ যাকে ভালবাসে, কেয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।
- ❖ মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।
- ❖ নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হবে।
- ❖ যে কাজ করে, সে কেবল আপন নিয়ত অনুযায়ীই তার ফল পায়।
- ❖ যুদ্ধ একটি কৌশল।
- ❖ দেখা ও শোনা এক কথা নয়।
- ❖ বৈঠকের জন্য বিশ্বস্ততা জরুরি।
- ❖ খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভাল কাজ।
- ❖ জনগণের যিনি সেবা করেন, তিনিই তাদের নেতা।
- ❖ প্রত্যেক সৌভাগ্যশীল ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়।
- ❖ ভাল কথা বলাও সৎকাজের শামিল।
- ❖ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।

রাসূল (সা) কী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কথা বলতেন! যেন পরশ বুলিয়ে যায়! যাদুর চেয়েও সেই কথা শক্তিতে প্রখর।

প্রতিটি শব্দই যেন এক একটি মধুভরা মৌচাক।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। রাসূল (সা) বলছেন :

'আমি তোমাদেরকে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি।

সামষ্টিক ব্যবস্থার জন্য নেতার আদেশ শুনা ও অনুসরণের জোর আহ্বান জানাচ্ছি।

হোক সে নেতা কোনো নিগ্রো ক্রীতদাস।

কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা অসংখ্য মতভেদে লিপ্ত থাকবে।

এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অবলম্বন করা, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং দাঁতের মাড়ি দিয়ে চেপে ধরা।

সাবধান! ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন নিয়ম চালু করা থেকে বিরত থেকো।

কেননা প্রত্যেক নতুন নিয়ম বিদআতই। আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি।

www.amarboi.org

রাসূলের (সা) সংক্ষিপ্ত কথা, ছোট বাক্য, কিন্তু কী অসাধারণ তার ক্ষমতা! কী ব্যাপক তার অর্থ!

আর কী সুবিশাল তার গভীরতা!

একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে রাসূল! প্রধানত কোন কোন জিনিস মানুষের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে তোলে?

দয়ার নবীজী মাত্র একটি বাক্যেই এই প্রশ্নের জবাব দিলেন : 'মুখ ও লজ্জাস্থান।'

একবার হযরত আলী (রা) রাসূলকে (সা) অনুরোধ করলেন, 'আপনি নিজের নীতি ব্যাখ্যা করুন।'

রাসূল (সা) জবাবে যা বললেন, তা আজকের জন্যও সমান বিস্ময়কর! ছোট ছোট বাক্য, অথচ সবই মৌলিক। সবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক অর্থপূর্ণ।

রাসূল (সা) বললেন,

'আল্লাহর পরিচয় আমার পুঁজি।

বুদ্ধি আমার দীনের মূল।

ভালোবাসা আমার ভিত্তি।

আকাঙ্ক্ষা আমার বাহন।

আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু।

আস্থা ও বিশ্বাস আমার সাথী।

জ্ঞান আমার অঙ্গ।

ধৈর্য আমার পোশাক।

আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার জন্য অতি বড় নিয়ামত।

বিনয় আমার সম্মান।

পার্থিব সম্পদের প্রতি নিস্পৃহতা আমার পেশা।

প্রত্যয় আমার শক্তি।

সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী।

আনুগত্য আমার রক্ষাকবচ।

জিহাদ আমার চরিত্র।

www.amarboi.org

আর নামায আমার চক্ষুশীতলকারী।'

এই হলো প্রিয় নবীর (সা) প্রিয় প্রসঙ্গ!

ছোট বাক্যে, অল্প কথায় তিনি তার গোটা জীবনকেই উপস্থাপন করলেন।

বেশি, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা রাসূল (সা) কখনই পছন্দ করতেন না। আবার কথায় কৃত্রিমতাও ছিলো তাঁর অপছন্দ।

রাসূল (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যারা কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে তারা হলো ঐসব লোক, যারা অতিরঞ্জিত করে কথা বলে, বেশি কথা বলে এবং কথার মধ্যে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে।"

সৌন্দর্য, ভদ্রতা, শিষ্টতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক, রুচি– এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের কথার মাধ্যমে।

যার কথা অসুন্দর, অশ্লীল, রুচিহীন, অমার্জিত– সে কীভাবে প্রকৃত ভাল মানুষ হবে? সুন্দর, ভাল আর সফল মানুষ হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে রাসূলের (সা) কাছে। তাঁর আদর্শের কাছে। তাঁর জীবনাদর্শেই আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে হবে।

কারণ, রাসূলই (সা) তো আমাদের জন্য সর্বোত্তম- শিক্ষক।

তাঁর তুলনা কোথায়?

আমাদের প্রিয় নবী (সা) কখনো কাউকে কষ্ট দিতেন না। তিনি ছিলেন ব্যক্তি জীবনে খুবই সাধারণ, কিন্তু মানুষ হিসেবে ছিলেন অসাধারণ।

আল-হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, আমি আমার মামা হিনদ ইবনে আবু হালাকে (রা) জিজ্ঞেস করে বললাম, আমাকে নবীর (সা) কথোপকথন সম্পর্কে একটু বলুন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সকল সময় উম্মাতের চিন্তায় ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

তাঁকে শান্ত ও নিশ্চিন্ত দেখা যেত না।

দীর্ঘ নীরবতা ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।

তিনি কথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করে কথা বলতেন এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে কথা বলতেন।

www.amarboi.org

তাঁর কথার শব্দ একটি অপরটি থেকে পৃথক ও সুস্পষ্ট হতো এবং তাঁর কথা প্রয়োজনের অতিরিক্তও নয় অথবা কমও নয়।

তিনি কারো প্রতি কঠোরভাষীও ছিলেন না এবং কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করতেন না।

তিনি নিয়ামতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন; তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এবং কখনো তার নিন্দা করতেন না।

খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তিনি কোনো রকম নিন্দাবাদ করতেন না, আবার অযাচিত প্রশংসাও করতেন না।

পার্থিব বা সাংসারিক কোনো বস্তুর কারণে তিনি কখনও রাগান্বিত হতেন না।

কিন্তু সত্য-ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘিত হলে তাঁর রাগ কিছুতেই থামতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতিকার করা হতো।

ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না।

তিনি কারো প্রতি ইশারা করলে পূর্ণ হাতেই ইশারা করতেন। কোনো বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলে তিনি হাত উল্টে (উপুড় করে) দিতেন। যখন কথা বলতেন, কখনো বাঁ হাত নাড়াতেন, কখনো বা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটে চাপ দিতেন।

তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাতেন।

তিনি যখন আনন্দিত হতেন (লজ্জাবশত) চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেলতেন।

তিনি বেশিরভাগ মুচকি হাসি দিতেন, তখন তাঁর দাঁতগুলো শিলাবৃষ্টির মতো চকচক করতো।

হযরত জারীর (রা) বলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কোনো সময় রাসূল (সা) আমাকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসি দিতেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (সা) আমাদের (ছোটদের) সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইটিকে

www.amarboi.org

কৌতুক করে বলতেন, 'হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর (ছোট পোষা পাখিটি)।'

নবী (সা) ছোটদের সাথে এভাবে বেশ কৌতুক করতেন।

এখানে তিনি এক ছোট বালককে ডাক নামে অভিহিত করেছেন। নবী (সা) তাকে বলেছিলেন, 'হে আবু উমাইর, কি হলো তোমার নুগাইরের।' বালকটির একটি বুলবুলি পাখি ছিলো। সে তাকে নিয়ে খেলাধুলা করতো। পাখিটি মরে গেলে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাকে কৌতুক করে বলেন, 'হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর?' সাহাবীগণ একবার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন?

তিনি বলেন : আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকও)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ রাসূলের (সা) খেদমত করেছি।

তিনি কখনো আমাকে উহ্ পর্যন্ত বলেননি (বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি।)

আমার কৃত কোনো কাজের জন্য তিনি আমাকে কখনো বলেননি : এটা তুমি কেন করলে অথবা কোনো কাজ না করায়ও তিনি কখনো বলেননি, এটা তুমি কেন করলে না?

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি রেশম ও পশমের মিশ্রণে তৈরি কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও স্পর্শ করেছি, কিন্তু রাসূলের (সা) হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি।

আমি কস্তুরির ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি, কিন্তু রাসূলের (সা) শরীরের ঘাম থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কিছুই পাইনি।'

সত্যিই কি এক অসাধারণ মহামানব!

কি বিস্ময়কর পরশপাথর!

সে জন্যই তো রাসূল (সা) আমার পরম প্রিয়। আপন অতি পরশমণি!■

www.amarboi.org

জীর্ণ ঘরে জোছনার হাসি

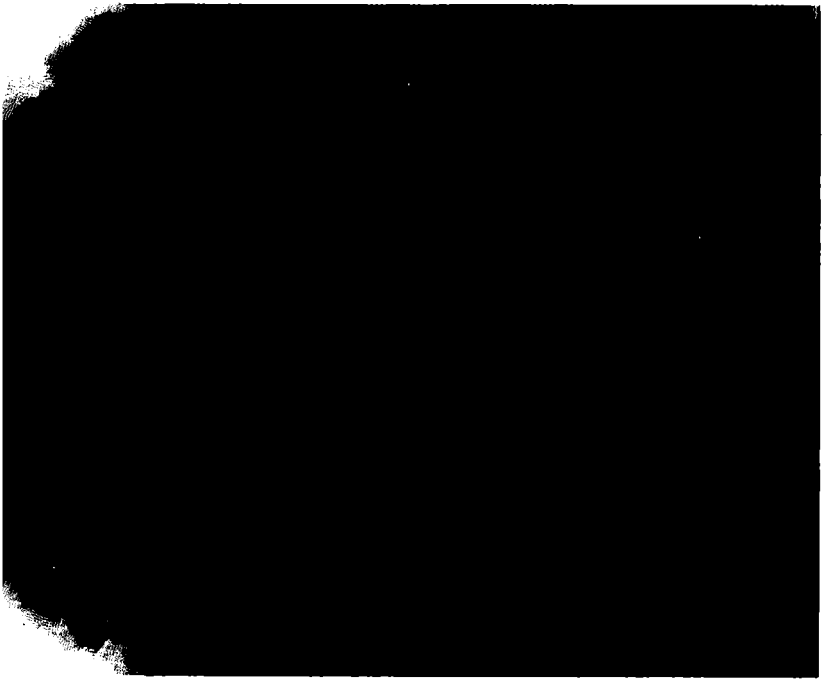

তাদের ঘরে ক্ষুধার আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে অষ্টপ্রহর।

কাজ নেই। অর্থও নেই। প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই।

রোগে-শোকে ওষুধ-পথ্য নেই!

কষ্ট আর কষ্ট!

কী নিদারুণ কষ্ট!

এইভাবে কি জীবন চলে? সংসার চলে!

এইভাবে আর কতদিন?

কতদিন আর এইভাবে বেঁচে থাকা যায়?

সংসারের পুরুষরা দিশাহারা।

www.amarboi.org

স্ত্রীরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভীষর্ণ চিন্তিত।

পাড়ায় পাড়ায় এমনি হাহাকার!

এমনি দুর্দশা!

সবাই চিন্তায় মগ্ন।

কি করা যায়!

একটা উপায় তো বের করা দরকার।

কি সেই উপায়?

পাড়ার মহিলারা অনেক ভেবে বের করলো একটা পথ।

তারা সিদ্ধান্ত নিল– চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি পাড়া ছেড়ে, গোত্র ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যদিকে। খাবারের তালাশে।

বিশ্বাস তাদের অটুট।

স্বপ্নটাও ভোরের শিশির ভেজা ঘাসের মতো।

তাদের বিশ্বাস– আমরা নিশ্চয়ই পারবো।

কেন পারবো না?

আমরা তো মা!

আমাদের কোলে ছোট ছোট বাচ্চা আছে।

তারা চুক চুক করে বুকের দুধ খায়।

আমরা খেতে না পাই, কিন্তু বাচ্চাদের খাবার ঠিকই আমাদের বুকে দিয়ে দিয়েছেন প্রভু।

আল্লাহর এ এক আশ্চর্য কুদরত এবং রহমত!

আমরা নিশ্চয়ই অন্য কোনো গোত্রে গিয়ে এমন শিশু পাবো যাদেরকে দুধ পান করালে আমরা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারবো। আর তাতে আমাদের অভাবও ঘুচে যাবে।

তা ঠিক, তা ঠিক।

সবাই একমত হয়ে যায়।

তবে আর দেরি কেন?

www.amarboi.org

না, দেরি নয়। চলো দ্রুত বেরিয়ে পড়ি ভাগ্যের অন্বেষণে।

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

তাদের গোত্রের নাম– বনু সা'দ।

এই দলের মধ্যে ছিলেন একজন সৌভাগ্যবতী মা–

নাম– হালিমা।

হালিমাও অন্য মহিলাদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

তার সাথে আছেন স্বামী, একটি দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট শিশুপুত্র এবং একটি জীর্ণ-শীর্ণ বয়স্ক উট, যে এক ফোঁটা দুধও দিতে পারতো না।

তাদের উদ্দেশ্য– কোথায় পাওয়া যায় দুধ-শিশু!

যাদেরকে দুধ খাওয়ানোর বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়!

হালিমা তার পরিবারসহ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন।

ঘরে অভাব আর অভাব।

তিনি আর সইতে পারছিলেন না অভাবের কষ্ট।

সংসারের এতগুলো পেট অভুক্ত থাকলে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলে কোন্ মা-ই বা আর স্থির থাকতে পারেন!

হালিমাও পারেন না।

তিনি ঠুকরে কেঁদে ওঠেন।

তার দু'চোখ দিয়ে কষ্টের ঝরনা বয়।

সেই ঝরনা এক সময় নদী হয়।

সাগর হয়।

তারপর সেখানে ওঠে বিশাল ঢেউ।

সে কেবল কষ্টের ঢেউ।

হালিমাসহ বনু সা'দ গোত্রের মহিলারা দুধ-শিশুর খোঁজ করছেন।

হালিমার কোলের শিশুটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেবলই কাঁদছে।

শিশুপুত্রের কান্নায় তার বুকের আগুন জ্বলে ওঠে দ্বিগুণ।

www.amarboi.org

এ সময় তাকে খাওয়ানোর মতো এতটুকু দুধও তার বুকে ছিলো না।

উটের পালানেও না।

তিনি দিশেহারা হয়ে একটি গাধার পিঠে বসলেন।

সাথে কাফেলার অন্যরাও।

ছুটতে থাকলেন সামনের দিকে।

কোথায় পাওয়া যায় দুধ-শিশু!

কোথায়!

পথটা ছিলো দীর্ঘ এবং দুর্গম।

সবাই ক্লান্ত।

ক্ষুধায় জর্জরিত।

ঘামে ভিজে একাকার।

বহু কষ্ট করে তারা মক্কায় পৌঁছুলেন।

মক্কায় অনেক দুধ-শিশু পাওয়া যায়।

আশা ও স্বপ্নে তাদের চোখ দুটো দিঘির ঢেউয়ের মতো টলমল করে উঠলো।

তারা খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলেন কুরাইশ গোত্রে।

খোঁজ পান এই গোত্রে আবু তালিবের ঘরে একটি শিশুপুত্র আছে।

তাদেরকে দেখে আবু তালিবের দারুণ খুশি।

তাদের একে একে সবাইকে অনুরোধ করলেন আবু তালিব তাদের শিশুপুত্রটিকে দুধ খাওয়ানোর ভার নেয়ার জন্য।

দলের অন্যরা দ্বিধাগ্রস্ত।

কারণ শিশুটির যে পিতা নেই! তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দেবে কে?

পিতৃহীন শিশুর দুধ খাওয়ানোর ভার নিতে তারা রাজি হলো না।

কিন্তু একজন, মাত্র একজন মা এগিয়ে গেলেন সামনে। তিনি দারুণ আনন্দে চাঁদের চেয়েও সুন্দর সেই পিতৃহীন শিশুটিকে কোলে তুলে বুক জাপটে ধরলেন।

অন্য মহিলারা হালিমার আগেই দুধ-শিশু পেয়ে গেছে।

www.amarboi.org

বাকি ছিলেন শুধু একজন।–

মা হালিমা।

এতিম শিশুটিকে নেয়ার সময় মা হালিমা তার স্বামীকে বললেন, সবাই তো দুধ-শিশু পেয়ে গেছে। আমিই কেবল পাইনি। এই কাফেলার সাথে আমি শূন্য হাতে ফিরে যেতে পারবো না। আমি এই এতিম শিশুটির ভার নেব। তার দায়-দায়িত্ব আমিই বহন করবো। অর্থ-কড়ি যাই পাই না কেন। স্বামী বললেন, সত্যিই। আমারও খুব ভালো লাগছে শিশুটিকে। তুমি তাকে নিতে পারো। আল্লাহ পাক হয়তো তাঁর মাধ্যমেই আমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ রেখেছেন!

এতিম শিশুটিকে নিয়ে মা হালিমা রওনা দিলেন নিজের কাফেলার দিকে।

গভীর রাত।

মা হালিমা একটু আগেও কোলের শিশুটিকে পর্যন্ত খাওয়াতে পারেননি একটু দুধ।

ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে বাছা।

অন্য পাশে আছেন সদ্য আনা চাঁদের চেয়েও সুন্দর শিশুটি।

হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর বুকে দুধের ভার।

তিনি তখনই নিজের ও সদ্য আনা শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করলেন।

তারা দু'জনই পেট ভরে দুধ খেয়ে পরম তৃপ্তির সাথে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর কি আশ্চর্য!

মা হালিমার স্বামী দেখলেন–

যে উটের পালান ছিলো একেবারে মরুভূমির মতো শুকনো, সেই পালানই এখন দুধে টইটম্বুর!

তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়।

তাঁদের হৃদয় চিরে বেরিয়ে এলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অঝোর বৃষ্টিধারা।

তাঁরা দু'জনই সেই রাতে উটের দুধ খেলেন পেট ভরে।

তখনও উটের পালান দুধে ভরপুর।

সকালে হালিমার স্বামী আনন্দ চিত্তে বললেন, দেখেছো হালিমা আল্লাহর কি

www.amarboi.org

রহমত! বলেছিলাম না এই শিশুই আমাদের জন্য বয়ে আনবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ কল্যাণ! বাস্তবেও দেখলে তো!

জেনে রাখো, তুমি এক মহাকল্যাণময় শিশু এনেছো।

হালিমা খুশি হয়ে বললেন, আমারও কিন্তু তাই মনে হয়।

কাফেলা চলেছে এবার আপন গোত্রের দিকে।

যে গোত্রে অভাবের কোনো শেষ নেই।

বৃষ্টি নেই।

ফসল নেই।

ঘাস লতাপাতা নেই।

আছে শুধু খরা আর খরা।

উট, ভেড়া, গাধাসহ পশুগুলোও খাবার না পেয়ে শুকিয়ে গেছে।

তাদের শরীরে গোশত নেই।

পালানে দুধ নেই।

কি করুণ অবস্থা!

ঘরে ফিরে আসার পর মা হালিমা দেখলেন এক আশ্চর্য পরিবর্তন।

এখন তাদের ছাগল ভেড়াগুলো সকালে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ফেরে পালান ভর্তি দুধসহ।

সেই দুধ দুইয়ে তারা পান করেন।

বাড়ির পশুগুলোর স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে নাদুস নুদুস।

এখন সেখানে বৃষ্টি হয়।

আর তাতে ঘাস তরুলতা তরতাজা হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে মা হালিমার ঘরটি ভরে গেল আল্লাহর অশেষ নিয়ামতে।

এভাবেই কেটে গেল দু'টি বছর।

এখন মা হালিমার শিশুটি যেমন স্বাস্থ্যবান, ঠিক তেমনি তার পালিত অপর সেই মহা সৌভাগ্যবান শিশুটিও।

মা হালিমা সাহস করে যে এতিম শিশুকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন।–

www.amarboi.org

জগৎ সেরা মহামানব, জোছনা প্লাবিত পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর– নবী মুহাম্মাদ (সা)।

তাঁকে বুকে তুলে নিয়েই তো বদলে গেল মা হালিমার পরিবারের অবস্থা!

কি সৌভাগ্যের পরশমণি নবী মুহাম্মাদ (সা)!

আর তাঁকে যিনি সাহস করে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, দুধ খাইয়ে বড় করেছিলেন– তাঁর তুলনা এবং মর্যাদা!

সে তো পরিমাপযোগ্য নয়।

মা হালিমা– সত্যিই সৌভাগ্যবতী এক দুধ-মা।

শিশুপুত্র মুহাম্মাদকে (সা) আদরে, সোহাগে বুকে তুলে নেয়ার কারণে যার পূর্বের সেই জীর্ণ ঘরে অঝোর ধারায় ঝরছিল আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, নিয়ামত এবং বরকতের ঝরনা ধারা। জীর্ণ ঘরে জোছনার হাসি!

সে তো কেবল সৌভাগ্যেরই বৃষ্টি।...■

www.amarboi.org

গুহার ভেতর
অবাক পুরুষ

সত্যের পথে চলেন যিনি
কার সাধ্য আছে গতিরোধ করে তার?
সত্যের বিজয় ও পুরস্কার– সে এক বিশাল ব্যাপার।
কী আর আছে সত্যের সমান?
মিথ্যার সীমানা আছে, কিন্তু সত্যের শক্তি ও সীমানা অসীম
মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় নেই!
খবরটি বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।–

www.amarboi.org

তিনি মক্কায় নেই? তাহলে? তাহলে কোথায় গেলেন মুহাম্মাদ (সা)? কুরাইশদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

খুঁজতে শুরু করলো চারদিকে।

খুঁজতে থাকে, তল্লাশি চালাতে থাকে বনী হাশিমের প্রতিটি বাড়ি। ছুটে যায় মহানবীর (সা) ঘনিষ্ঠজনদের বাড়িতেও। যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে তাঁকে। কুরাইশদের এটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

দুষ্টরা খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেল আবু বকরের (রা) বাড়িতে। তাদের মুখোমুখি হলেন আবু বকরের (রা) মেয়ে আসমা। জিজ্ঞেস করলেন নির্ভয়ে, কি ব্যাপার!

কুরাইশ নেতা পাপিষ্ঠ আবু জেহেল। চোখে-মুখে তার হিংস্রতার ছাপ। রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আব্বা কোথায়?'

আবু জেহেলের সামনে আসমা সংশয়হীন, স্থির। বললেন, 'জানি না! তিনি এখন কোথায় তা আমি কেমন করে জানবো?'

আসমার জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো নরাধম আবু জেহেল। সাথে সাথে সে আসমার গালে বসিয়ে দিল একটি সজোরে থাপ্পড়। থাপ্পড়ের আঘাতে আসমার কানের দুলটি ছিটকে পড়লো দূরে। তিনিও লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো চারপাশ। কেঁদে উঠলো মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা।

আসমার গালে থাপ্পড়ের চিহ্ন! একি কোনো মানুষের কাজ!

থমকে দাঁড়ালো মক্কার বাতাস। আবু বকরের (রা) বাড়ি থেকে ফিরে এলো আবু জেহেল।

তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে ভাবলো, কোথাও যখন মুহাম্মাদকে (সা) পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই তিনি চলে গেছেন মক্কা থেকে।

সঙ্গোপনে। কিন্তু কোথায় যাবেন? কত দূরে? অস্থিরভাবে ভাবতে থাকলো আবু জেহেল।

মুহূর্ত মাত্র।

www.amarboi.org

তারপর একদল পদচিহ্ন বিশারদকে লাগিয়ে দিল কাজে। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হলো রাসূলকে (সা) খুঁজে বের করার।

রাসূলের (সা) পদচিহ্ন ধরে তাঁকে ধরার জন্য তারা বেরিয়ে পড়লো।

মক্কা থেকে বেরিয়ে রাসূল (সা) আশ্রয় নিয়েছেন সাওর পর্বতের গুহায়।

সাথে আছেন প্রিয় সাথী আবু বকর (রা)। সাওর পর্বতের গুহায় তাঁরা অবস্থান করছেন।

ঠিক এমন সময় আবু জেহেলের নিয়োগকৃত পদচিহ্ন বিশারদরা কুরাইশদের সাথে পৌঁছে গেল সেখানে।

তারা কুরাইশদেরকে বললো, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ এখানে, এই সাওর পর্বতের গুহাতেই আছে।'

'সত্যিই?' কুরাইশদের চোখে-মুখে দ্বিধা আর সংশয়। হৃদয়ে প্রতিহিংসার তুফান।

'কেন নয়? নিশ্চয়ই আছে। এখন কেবল তাদেরকে খুঁজে বের করার পালা।'

গুহার ভেতর জ্যোতির্ময় মহান পুরুষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা)। সাথে তাঁর প্রিয়বন্ধু আবু বকর। গুহার ভেতর থেকেই তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন শত্রুদের সকল কথা।

শুনতে পাচ্ছেন তাদের পদধ্বনি। এমনকি দেখতে পাচ্ছেন তাদের পায়ের পাতা।

মাথার ওপরেই শত্রুদের পা। আর গুহার ভেতর তাঁরা। শঙ্কিত আবু বকর (রা)। এই বুঝি শত্রুরা ধরে ফেললো তাঁদের!

তারপর?–

ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি। চোখ দু'টো টলমল দীর্ঘ। শ্রাবণ যেন বা নেমে এসেছে মুষলধারায় আবু বকরের (রা) চোখে। বুকের ভেতর এ কিসের শব্দ?

তাঁর দিকে তাকালেন রাসূল (সা)! কী প্রশান্ত, কী শীতল এক দৃষ্টি!

www.amarboi.org

চড়ুইয়ের পালকের চেয়েও যেন হালকা রাসূলের (সা) হৃদয়। সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। দুর্ভাবনা নেই। নেই কোনো পরিণামের ভয়।

প্রিয় সাথী আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'চোখে পানি কেন?'

আবু বকর কিছুটা কাঁপাস্বরে বললেন, 'রাসূল (সা)! হে প্রিয়তম রাসূল আমার! আমার পরিণামের কথা ভেবে আমি কাঁদছিনে। কাঁদছি কেবল আপনার কথা চিন্তা করে। আল্লাহ না করুন, ওরা যদি আপনার প্রতি কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করে, আর তা যদি আমাকে দেখতে হয়, তাহলে আর এর চেয়ে বেদনার আর কিছুই থাকবে না। না, সে আমি সইতে পারবো না কিছুতেই!'

রাসূলের (সা) কণ্ঠ স্থির। স্থির এবং গভীর বিশ্বাসে সুদৃঢ়।

বললেন, 'দুশ্চিন্তা করো না আবু বকর!

আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন।'

তাঁদের মাথার ওপর শত্রুরা। আবু বকর তখনো চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না।

রাসূলকে (সা) বললেন, 'হে রাসূল! তারা যদি কেউ তাদের পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখে ফেলবে!'

আবারও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন রাসূল, 'আবু বকর! তুমি কি মনে করো আমরা মাত্র দু'জন? ভয় পেও না। আল্লাহ পাকও আমাদের সাথে আছেন।'

সাওর পর্বতের গুহার ভেতর রাসূল (সা) এবং হযরত আবু বকর। আর তাঁদের মাথার ওপর কুরাইশ দস্যুরা। তাদের সাথে আছে পদচিহ্ন বিশারদ।

কুরাইশদের একজন বললো, 'এসো। তোমরা সবাই গুহার দিকে এগিয়ে এসো। গুহার ভেতরটাও আমরা একটু ভাল করে দেখে নিই। হতে পারে, এখানেই লুকিয়ে আছেন মুহাম্মাদ (সা)।'

সত্যিই আল্লাহর কী মহিমা! লোকটির কথা শুনে উমাইয়্যা ইবন খালফ তাকে তিরস্কার করলো। উপহাসের সাথে বললো, 'গুহার ভেতর যাবে? দেখছো না, গুহার মুখে মাকড়সা ও তার বাসা! এগুলো খুবই পুরনো। গুহার ভেতর যদি কোনো লোক প্রবেশ করতো, তাহলে অবশ্যই এই

www.amarboi.org

মাকড়সা ও তার জাল এখানে থাকতো না। আহম্মক আর কাকে বলে! চলো, ফিরে চলো এখান থেকে!'

আবু জেহেল গম্ভীর। এক সময় মুখ খুললো সে! বললো, 'লাত ও উজ্জার শপথ! আমার মনে হচ্ছে তারা আমাদের কাছাকাছি কোথাও আছে। আমাদের কথা তারা শুনছে। তারা দেখছে আমাদেরকে। দেখছে আমাদের সকল কার্যকলাপ। কিন্তু তাঁর কী এক ইন্দ্রজালে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে আমরা তাঁদেরকে আদৌ দেখতে পাচ্ছিনে। কী দুর্ভাগ্য আমাদের!'

আবু জেহেলদের ব্যর্থ হলো সাওর পর্বতের অভিযান। ব্যর্থ হলো। কিন্তু তাই বলে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকলো না। বরং আরো দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাসূলকে (সা) খোঁজার জন্য।

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত প্রতিটি গোত্রে ঘোষণা দিল, 'কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মাদকে (সা) জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারে, তবে তাকে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে একশটি উন্নত জাতের উট।'

'কুদাইদ' নামক স্থানে বসে আড্ডায় মজেছিল এক যুবক।

নাম– সুরাকা ইবন মালিক। আড্ডায় মশগুল থাকলেও খবরটি প্রবেশ করলো তার কানে। কম কথা নয়! একশো উট!–

লালসার আগুনে জ্বলে উঠলো সুরাকার জিহ্বা।

আড্ডার একজন বললো, 'আল্লাহর শপথ! আমার পাশ দিয়ে এই মাত্র তিনজন লোক চলে গেল। আমার মনে হয় তাদের একজন মুহাম্মাদ, একজন আবু বকর এবং একজন তাদের পথপ্রদর্শক।'

পুরস্কারটি নিজে পাওয়ার জন্য সুরাকা কৌশলের আশ্রয় নিল। বললো, 'কি যা তা বলছো!

ওরা তাদের কেউ নয়। বরং ওরা হচ্ছে অমুক গোত্রের লোক। তাদের হারানো উট তালাশ করে বেড়াচ্ছে।'

লোকটি সরল মনে বললো, 'তা বটে।

হলেও হতে পারে!'

www.amarboi.org

এবার সুরাকার পালা।

সুযোগ বুঝে সে চুপে চুপে উঠে পড়লো আড্ডা থেকে।

তারপর সোজা বাড়ি।

বাড়িতে পৌঁছে দাসীকে বললো, 'কেউ যেন দেখতে না পায়, চুপে চুপে এমনভাবে তুমি আমার ঘোড়াটি বেঁধে এসো অমুক উপত্যকায়।' আর দাসকে বললো, 'এই অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে ঘোড়ার আশপাশে রেখে দেবে, যেন কেউ বুঝতেই না পারে। বুঝতে পেরেছো? যাও, দ্রুত কাজ সার।'

চতুর সুরাকা।

সুরাকা ছিলো তার গোত্রের সবচেয়ে দক্ষ ঘোড়সওয়ার, দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী, পদচিহ্ন বিশারদ ও বিপদে দারুণ ধৈর্যশীল।

সুরাকার ঘোড়াটিও ছিলো উন্নত জাতের।

তেজি।

বর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুরাকা দাবড়িয়ে দিল তার ঘোড়া।

বাতাসের গতিতে ছুটছে তার ঘোড়াটি।

উদ্দেশ্য, মুহাম্মাদকে (সা) ধরা। আর তার বিনিময়ে একশটি উট পুরস্কার হিসেবে পাওয়া।

কিন্তু একি হলো! কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ হোঁচট খেল ঘোড়াটি। আর ঘোড়ার পিঠ থেকে দূরে ছিটকে পড়লো সুরাকা। আবার উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। কিছুদূর যেতে না যেতেই আবারও হোঁচট খেল ঘোড়াটি।

ব্যাপার কি! এমন হচ্ছে কেন? নানা ধরনের জিজ্ঞাসা আর অশুভ চিন্তায় মুষড়ে পড়লো সুরাকা। ভাবলো, 'মুহাম্মাদকে (সা) ধরা আমার কাজ নয়। জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

কিন্তু একশো উট! এতগুলো উটের লোভে সে আবারও চেপে বসলো ঘোড়ার পিঠে।

এবার সামান্য দূরেই দেখতে পেল মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর দুই সাথীকে।

কাছে। খুব কাছে আর দেরি নয়। সাথে সাথে সে তার ধনুকের দিকে হাত

www.amarboi.org

বাড়ালো। কিন্তু হায়! একি হলো! হাতটিও যে আর কাজ করছে না। কেমন অসাড়, কেমন নিস্তেজ। তার হাত আর চললো না।

ওদিকে কী ভীষণ ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখলো তার ঘোড়ার পা যেন শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে। আর সামনে থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেললো তাকে ও তার ঘোড়াটিকে। সুরাকা চেষ্টা করলো ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে নিতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। ঘোড়ার পা যেন অনড় পাথর। কেঁপে উঠলো সুরাকার বুক!

করুণ কণ্ঠে আরজ জানালো রাসূলকে (সা) 'আপনার প্রভুর দরবারে দোয়া করুন। আমার ঘোড়ার পা যেন মুক্ত হতে পারে। আমি আপনাদেরকে কোনো ক্ষতি করবো না।'

তার জন্য দোয়া করলেন দয়ার নবীজী (সা)। ক্ষমা করে দিলেন সুরাকাকে। ঘোড়াটি মুক্ত হলো।

আবারও লালসার আগুনে জ্বলে উঠলো সুরাকা। চেষ্টা করলো ঘোড়া দাবড়িয়ে তাঁদেরকে ধরার জন্য। কিন্তু সেই একইভাবে আবারও ঘোড়াটির পা দেবে গেল মাটিতে।

পারলো না সুরাকা। পারলো না শত চেষ্টাতেও। পারলো না কোনোভাবেই রাসূলকে (সা) ধরতে।

বরং নিজের জীবনই বিপন্ন দেখে এবার কাতরকণ্ঠে কসম খেয়ে বললো, 'আর নয়! এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। সত্যিই আমি আপনাদেরকে কোনো ক্ষতি করবো না। দয়া করে আমার ও এই ঘোড়াটির জন্য একটু দোয়া করুন আমরা মুক্ত হলে চলে যাবো। আপন গৃহে। আমার অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য-পানীয়, সব– সবই দিয়ে দেব আপনাদের। আর মুক্তি পেলে আমি আমার পেছনের ধাবমান সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিংবা হটিয়ে দেব অন্য দিকে।'

রাসূলসহ তাঁরা বললেন, 'তোমার কোনো কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে কথা দাও, পেছনে ধাবমান লোকদেরকে তুমি আমাদের থেকে দূরে হটিয়ে নিয়ে যাবে!'

'অবশ্যই। একশ বার।' সুরাকা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলো।

www.amarboi.org

এবার রাসূল (সা) তার জন্য দোয়া করলেন।

মুক্ত হলো সুরাকা আর তার ঘোড়া। সে ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে বললো, 'আপনারা একটু থামুন। আমার কিছু কথা আছে। আল্লাহর কসম! আমি কোনো ক্ষতি করবো না।'

'তুমি আমাদের কাছে কি চাও?'

সুরাকা বললো, আল্লাহর কসম হে মুহাম্মাদ!

আমি নিশ্চিত জানি শিগগিরই আপনার দীন বিজয় হবে। আমার সাথে আপনি ওয়াদা করুন, আমি যখন আপনার সাম্রাজ্যে যাব, আপনি তখন আমাকে সম্মান দেবেন।

'হ্যাঁ, দেব।'

'তাহলে এ কথাটি একটু লিখে দিন।'

রাসূল (সা) একখণ্ড শুকনো হাড়ের ওপর আবু বকরকে (রা) কথাগুলো লিখতে বললেন।

লেখা শেষ হলে সেটা নিয়ে সুরাকা চলে যাচ্ছে।

রাসূল (সা) তাকে ডেকে বললেন, 'সুরাকা তুমি যখন কিসারার রাজকীয় পোশাক পরবে তখন কেমন হবে?'

বিস্ময়ের সাথে সুরাকা ফিরে দাঁড়ালো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসরা ইবন হুরমুয?'

রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা ইবন হুরমুয।'

অবিশ্বাস্যের মতো শুনালেও কেঁপে উঠলো সুরাকা। একবুক খুশি আর বিস্ময় নিয়ে পেছনে ফিরে গেল সে। পথে যারা রাসূলকে (সা) খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল, তাদেরকে সে সত্যিই ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলের (সা) কথাটি চেপে রাখলো ততদিন, যতদিন না তার ধারণা ছিলো, রাসূল (সা) মদীনা পৌঁছে গেছেন।

এক সময় আবু জেহেলের কানে গেল কথাটি। সে সুরাকাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করলো। আবু জেহেলের তিরস্কারে দুলে উঠলো সুরাকার

www.amarboi.org

কবিহৃদয়। কবি হিসেবেও তার সুনাম ছিলো। আবু জেহেলের তিরস্কারের জবাবে আবৃত্তি করলো :

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,

আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা ডুবে

যাচ্ছিল, তুমি জানতে– এবং

তোমার কোনো সংশয় থাকতো না,

মুহাম্মাদ প্রকৃত রাসূল–

সুতরাং কে তাঁকে গতিরোধ করে?'

সময় গড়িয়ে যায়।

এক সময় মক্কা বিজয় করলেন রাসূল (সা)।

মক্কা বিজয়ের পর, সুরাকা ছুটে এলেন রাসূলের (সা) কাছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সুরাকা রাসূলের (সা) দেয়া প্রতিশ্রুতির স্মারক হিসেবে সেই হাড়টি বের করে দেখালেন।

রাসূল (সা) সুরাকাকে বললেন, 'এসো। আমার কাছে এসো। আজ প্রতিশ্রুতি পালন ও সদ্ব্যবহারের দিন।'

সুরাকা খুশি আর প্রশান্ত হৃদয়ে রাসূলের (সা) কাছে গেলেন এবং তারপরই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

কী আশ্চর্য!

এই সুরাকা সত্য সত্যই কিসরার রাজকীয় পোশাক পরার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যেন রাজ পোশাক নয়– সে এক জরিদার জমিন।

সেটা ছিলো খলিফা উমরের (রা) সময়ে।

প্রকৃত অর্থে, সত্যের পথে চলেন যিনি, কার সাধ্য আছে গতিরোধ করে তার?

সত্যের বিজয় ও পুরস্কার– সে এক বিশাল ব্যাপার। কী আর আছে সত্যের সমান? মিথ্যার সীমানা আছে, কিন্তু সত্যের শক্তি ও সীমানা অসীম।■

www.amarboi.org

তায়েফের পথে আলোর পথিক

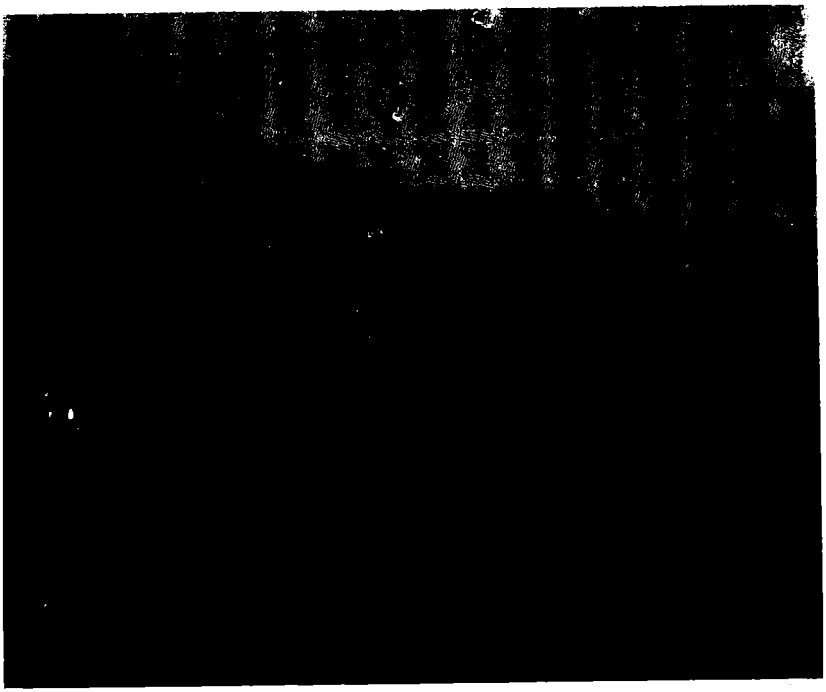

ভাবছেন আর ভাবছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

কি করবেন এখন?

মক্কার শত্রুদের আক্রমণ দিনে দিনে বাড়ছে। উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মক্কা নগরী বিষাক্ত। অশান্ত লু হাওয়া। আপাতত আর মক্কায় থাকা চলবে না। এখানে এখন ইসলাম প্রচার করা সম্ভব নয়।

তাহলে? কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন নবী (সা)। তারপর।–

তারপর সুদূরের পথ তায়েফ। বহু-বহু- দূরের পথ। নবীজী (সা) মক্কা থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন।

মরুভূমির পথ। বালি আর বালি। কোথাও কোনো গাছ নেই। নদী নেই। শুধু আছে ধু-ধু মাঠ। আর আছে ছোট বড় পাহাড় পর্বত। পাথরের নুড়ি।

www.amarboi.org

বহু পথ অতিক্রম করে চলে এসেছেন নবী (সা)। প্রায় সত্তর মাইল। পায়ে হেঁটে। বন্ধুর পথ। উঁচু-নিচু। পাথরের নুড়ি ছড়ানো। বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন দয়ার নবীজী (সা)।

বাস নেই। প্লেন নেই। জাহাজ কিংবা লঞ্চও নেই। এক আছে গাধা এবং উট। প্রিয় নবীর সাথে সেসব বাহনও নেই। তিনি চলেছেন পায়ে হেঁটে। ক্রমাগত হাঁটছেন তিনি।

আহার নেই।

নিদ্রা নেই।

বিশ্রাম নেই।

তিনি হাঁটছেন।

অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে, বহু কষ্টে তিনি পৌঁছে গেলেন তায়েফ।

অপরিচিত একটি দেশ। অজানা-অচেনা রাস্তা-ঘাট। অচেনা এখানকার মানুষ-জনপদ।

তবু মুসলমানের জন্যে প্রত্যেকটি দেশই তার নিজের দেশ।

প্রত্যেকটি দেশের মানুষই তার আপন মানুষ। কাছের মানুষ। প্রত্যেকটি দেশেই তার ঘর।

পেছনে মক্কা নগরী ফেলে নবীজী (সা) সুদূর তায়েফে এসেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্যে।

মক্কার মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। বরং তাঁকে কষ্ট দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু তিনি নিরাশ হননি। হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি অবশেষে কষ্ট স্বীকার করে তায়েফ এসেছেন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে।

মানুষকে সত্য পথে ডাকতে।

আল্লাহর বাণী শোনাতে।

সুন্দর শহর তায়েফ। মনোরম।

তায়েফের আবহাওয়াতে ছটফটানি নেই। ঝড়ের দাপাদাপি নেই। একটানা রোদের তেজ নেই। আবার একটানা বৃষ্টিও নেই। চারদিকে সবুজের

www.amarboi.org

হাতছানি। ক্ষেত ভরা ফসল। সবুজ সবজির ঢেউ তোলা ভাঁজ। খেজুর গাছের ঘন পল্লবে আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে তায়েফের প্রান্তর। প্রাচুর্য আর সম্পদের শহর– তায়েফ।

কিন্তু সম্পদে তো আর সুখ বয়ে আনে না। সুখ আনে– মনের সৌন্দর্য, কোমলতা, পবিত্রতা এবং উত্তম চরিত্রে।

তায়েফবাসীদের সম্পদ ছিলো অঢেল। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিলো না। কেননা, তখনো সেখানে সুন্দর মানুষ গড়ে উঠেনি। তারা একে অপরের সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকতো। অপরের হক অবৈধভাবে নষ্ট করতো। তারা বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত ছিলো।

আঁতকে উঠলেন নবী (সা)। তাঁর কোমল হৃদয়ে ব্যথার জোয়ার দুলে উঠলো। তিনি দয়াল নবী। মানুষের অধঃপতন তিনি দেখতে পারেন না।

মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা। তাদের স্থান সবার ওপরে। কিন্তু পাপী মানুষের স্থান?

নবীজী (সা) ভাবেন– না, এদের কোনো দোষ না। কেননা এদের কাছে কোনো উত্তম এবং সুন্দর পথের আহ্বান আসেনি। এরা এখনো আলোর ছোঁয়া পায়নি। শোনেনি– সত্য সুন্দরের সুমিষ্ট বাণী।

নবীজী (সা) ভাবেন– তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিতেই তো আমাকে মহান রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছেন। সুতরাং তায়েফবাসীকে দেখাতে হবে আলোর পথ।

তিনি উদাত্ত আহ্বানে তায়েফবাসীকে ডাকেন আলোর পথে।

ডাকেন সত্যের পথে।

কল্যাণের পথে।

তিনি তায়েফবাসীকে বুঝালেন– একদিন তোমরা মরে যাবে। কবরে যেতে হবে। কৃতকর্মের জন্যে হিসাব হবে। পাপ ও অন্যায় কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে।

অতএব ফিরে এসো সত্যের পথে।

ফিরে এসো আল্লাহর পথে।

www.amarboi.org

তিনি সত্য। তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সত্য।

তাঁর দ্বীন-ইসলাম সত্য।

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কোনো প্রভু নেই। ত্রাণকর্তা নেই। তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।

আমার কাজ তোমাদের কাছে সত্যবাণী পৌঁছে দেয়া।

নবীর (সা) আহ্বানে তায়েফের অনেকেই সাড়া দিল। তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। দীর্ঘদিনের আঁধারের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তারা আলোর ঝলকানিতে নতুন করে তাজা হয়ে উঠলো। সবল হলো। শান্তি ফিরে পেল।

কিন্তু কাফেররা রুখে দাঁড়ালো।

তাদের বিষাক্ত থাবা বেরিয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো তারা তায়েফের অলিতে গলিতে।

কাফেরদের বুকে দাউ দাউ প্রতিশোধের আগুন। কে এসে তাদের কওমের লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে?

কাফেররা আরও ক্ষেপে যায়।

মহানবী (সা) তাদেরকে আহ্বান জানান–

এসো সত্যের পথে।

এসো আলোর পথে।

এসো আল্লাহর পথে।

কাফেররা নবীর কথা শোনে না।

তারা প্রিয় নবীকে কষ্ট দিতে শুরু করে। পাথর ছুঁড়ে মারে। নবীজীর (সা) পবিত্র শরীর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে। রক্তে ভিজে যায় তাঁর দেহ। কদম মুবারক। তিনি কষ্ট পান। কিন্তু তিনি নিরাশ হন না। শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা কষ্টকে অকাতরে সহ্য করে তবু ঠোঁটে হাসির ফুয়ারা ঝরিয়ে তাদেরকে তিনি ডাকেন–

এসো সত্যের পথে।

এসো আলোর পথে।

www.amarboi.org

এসো কল্যাণের পথে।

আল্লাহর পথই একমাত্র উত্তম পথ।

মুহাম্মাদের (সা) সাথীরা বললেন, কাফেরদের জন্যে বদ দোয়া দিন নবী। তারা তো শুধু কষ্টই দিয়ে যাচ্ছে। শত্রুতা করছে আমাদের সাথে।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) দয়ার নবী। তিনি কেন বদ দোয়া দেবেন? প্রিয় নবী (সা) ক্ষমা করে দিলেন তাদেরকে।

নবীজীর ক্ষমা এবং মহানুভবতা দেখে কাফেরদের অনেকেই বিস্মিত হলো। অবাক হয়ে তারা নবীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের ভেতরে অনুশোচনার ঝড় বয়ে যায়। কৃতকর্মের জন্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করে। লজ্জিত হয়ে নবীর (সা) কাছে ক্ষমা চায়।

নবীজী তাদেরকে কোমল হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করেন। ইসলামের ছায়াতলে তাদের অশান্ত, অতৃপ্ত হৃদয়কে ডেকে নেন। তাদেরকে শোনান আল্লাহর বাণী। তারা পুলকিত হয়ে নবীকে (সা) আপন করে নেয়। তায়েফে সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে যায়।

কাফেররা এতে আরও বেশী ক্ষেপে যায়।

নবীকে (সা) কষ্ট দেবার জন্যে, তাঁকে সত্যের আহ্বান থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা নতুন নতুন কৌশল বের করে।

কিন্তু দয়ার নবী (সা) সব বাধাই দু'পায়ে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চলেন। ক্রমাগত সামনে।

চরম ধৈর্যের সাথে তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করেন–

হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে সঠিক জ্ঞান দাও।

ঈমান দাও। এরা অবুঝ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝেনা।

এদের অন্তর থেকে সকল কালিমা দূর করে দাও।

এদের ওপর রহমত করো।

চরম শত্রুতা করা সত্ত্বেও এভাবে দয়ার নবী (সা) দোয়া করলেন তায়েফের অবিশ্বাসীদের জন্যে।■

www.amarboi.org

হাসে দরিয়ার দুই কূল

সেই এক সময় বটে! কী আবেগঘন! নিবিড় প্রশান্তির! দু'জনই বেড়ে উঠছেন একই সাথে। দু'জনের বয়স প্রায় একই।

তবুও একজন চলেছেন আলোকিত সূর্যের পথে। আর অপর জনের পথটি ভয়ানক পিচ্ছিল। তার পথের চারপাশ থকথক করছে এক ভয়াবহ গাঢ় অন্ধকার।

দু'জনই পরম আত্মীয়। সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা। কিন্তু তখনও দু'জনের পথ বয়ে গেছে দু'দিকে। যেন দুইটি সাগর। একটির পানি স্বচ্ছ। অপরটির পানি দূষিত।

এই দু'জনের একজন– প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। আর অপরজন– আব্বাস ইবনুল মুত্তালিব।

www.amarboi.org

আব্বাস সমবয়সী হলেও সম্পর্কে ছিলেন রাসূলের (সা) চাচা।

ইসলামের দাওয়াত তখন চলছে প্রকাশ্যভাবে। রাসূল (সা) সবাইকে ডাকছেন– আল্লাহর পথে। ইসলামের পথে। সত্যের পথে।

তাঁর আহ্বানে একে একে ভারী হয়ে উঠছে মুসলমানের সংখ্যা। অন্ধকার থেকে ফিরে আসছে তারা আলোর পথে। বুকটা জুড়িয়ে নিচ্ছে ঈমানের শীতল পানিতে। আহ! কী আরাম! বহুকালের তৃষিত হৃদয় তাদের মুহূর্তেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চাচা আব্বাস।–

তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন ভাতিজা মুহাম্মাদকে (সা)। কিন্তু তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই বলে মক্কার অন্যান্য হিংস্রদের মতো তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়েও আসেননি। কোনোদিন বের করেননি তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের নখর। নিজে ইসলাম গ্রহণ না করেও তিনি সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন রাসূলকে (সা)।

বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ইসলামের দাওয়াত চারপাশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

আশ্চার্যের কথাই বটে! তার সাহায্য সহযোগিতার সেই দৃষ্টান্তও ছিলো বিস্ময়কর।

হজ্জের মৌসুম। মদীনা থেকে বাহাত্তর জন আনসার মক্কায় এলেন। তারা একত্রিত হয়েছেন মিনায় একটি গোপন শিবিরে।

সবাই রাসূল (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আহ্বান জানালেন, হে দয়ার নবীজী! মক্কাবাসীরা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। চলুন, আপনি আমাদের সাথে। মদীনায় চলুন। আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত মদীনার প্রশস্ত প্রান্তর। হাজারো তৃষিত হৃদয়।

আব্বাস তখনও মুসলমান হননি। কিন্তু অবাক কাণ্ড! তিনিও উপস্থিত ছিলেন এই গোপন শিবিরে। আনসারদের আহ্বান খুব মন দিয়ে শুনলেন আব্বাস।

তারপর তাদেরকে বললেন : 'হে খাযরাজ কওমের লোকেরা! আপনাদের

www.amarboi.org

জানা আছে মুহাম্মাদ (সা) তাঁর গোত্রের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সাথেই আছেন। শত্রুর মোকাবেলায় সর্বক্ষণ আমরা তাঁকে হেফাজত করেছি। এখন তিনি আপনাদের কাছে যেতে চান। যদি আপনারা জীবনপণ করে তাঁকে সহায়তা করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো কথা। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দিন।'

থামলেন আব্বাস।

তার কথাটা গুরুত্বের সাথে ভাবলেন তারা। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। রাসূল (সা) আমাদের কাছে পূর্ণ হিফাজতেই থাকবেন। আমরা তো আছিই তাঁর চারপাশে।

তাদের আশ্বাসের মধ্যে ছিলো না কোনো খাঁদ। ছিলো না কোনো ফাঁকি বা চালাকিও।

এর কিছুদিন পরই নবী (সা) হিজরতের অনুমতি পেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দয়ার নবীজী মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন মদীনায়। নবীজী মদীনায়। ইতোমধ্যে বদর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আব্বাস তখন মক্কায়।

কী নির্মম পরিহাস! মক্কার কুরাইশদের সীমাহীন চাপের মুখে আব্বাসকেও রাসূলের (সা) প্রতিপক্ষে লড়াই করতে যেতে হলো। বদর প্রান্তে! কী নিষ্ঠুর দৃশ্য! প্রাণপ্রিয় ভাতিজার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে হচ্ছে চাচা আব্বাসকে!

কিছুতেই তিনি এটা মেনে নিতে পারছেন না। পরিস্থিতি এমনই, যে তিনি অন্য কিছু করতেও পারছেন না। সেই এক কঠিনতম দুঃসময়। আব্বাসের জন্য।

বদর প্রান্তর! বদর মানেই তো কঠিন পরীক্ষার এক আগুনের হলকা। যুদ্ধ চলছে তুমুল গতিতে। যুদ্ধ চলছে মুসলিম আর মুশরিকদের মধ্যে।

কিন্তু আল্লাহর রহমতে শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেন সত্যের সৈনিক– মুসলিম বাহিনী।

বদরে মুশরিকদের সাথে আব্বাস ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেন যোগ দিয়েছিলেন– তা সম্পূর্ণ জানতেন দয়ার নবীজী। এ জন্য তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন তার সাথীদেরকে : 'যুদ্ধের সময় আব্বাস বা বনু হাশিমের কেউ সামনে

www.amarboi.org

পড়লে তাদেরকে হত্যা করবে না। কারণ, জোরপূর্বক তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়েছে।'

যুদ্ধ শেষ। মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন মুশরিকদের সাথে আব্বাস, আকীল ও নাওফিল ইবন হারিস। নিয়ম অনুযায়ী সকল বন্দীকেই বেঁধে রাখা হয়েছে। তার ভেতরে আছেন আব্বাসও। কিন্তু অন্যদের চেয়ে আব্বাসের বাঁধনটি ছিলো অনেক বেশি শক্ত। এত শক্তভাবে তাকে বাঁধা হয়েছিল যে তিনি বেদনায় কেবলই কঁকিয়ে উঠছিলেন। রাতে ঘুমিয়ে আছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)!

হঠাৎ এক কাতর কণ্ঠের ধ্বনিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলেন দয়ার নবীজী। সাহাবীরা রাসূলের (সা) ঘুমের ব্যাঘাতের কথা ভেবে আব্বাসের বাঁধনটি ঢিলা করে দিলেন।

থেমে গেল তার যন্ত্রণাদায়ক কঁকানি। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! আর কোনো কঁকানি শুনছি না কেন? তারা বললেন, তার বাঁধন ঢিলা করে দিয়েছি। রাসূল (সা) সাথে সাথে নির্দেশ দিলেন : 'সকল বন্দীর বাঁধনই ঢিলা করে দাও।'

ইনসাফ আর ইহসান কাকে বলে? রাসূলই (সা) তার উত্তম নিদর্শন।

বদর যুদ্ধে বন্দীদের কাছ থেকে 'মুক্তিপণ' নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আব্বাসের আম্মা ছিলেন মদীনার আনসার গোত্র খাযরাজের কন্যা। এই কারণে খাযরাজ গোত্রের সবাই রাসূলের (সা) কাছে অনুরোধ করলো; আব্বাস তো আমাদেরই ভাগ্নে। আমরা তার মুক্তিপণ মাফ করে দিচ্ছি।

তাদের প্রস্তাব একবাক্যে নাকচ করে দিলেন রাসূল (সা)। না, তা কখনই হতে পারে না। কারণ এটা সাম্যের খেলাফ। বরং তিনি আব্বাসের মুক্তিপণের পরিমাণটা একটু বেশিই করে দিলেন। কারণ তিনি জানতেন, সেই অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতা তার আছে।

এত অর্থ? বিস্মিত হয়ে আব্বাস অনুনয় বিনয়ের সাথে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি তো অন্তর থেকে আগেই মুসলমান হয়েছিলাম। মুশরিকরা আমাকে বাধ্য করেছে এই যুদ্ধে অংশ নিতে। আব্বাসের কথা

www.amarboi.org

শুনে রাসূল (সা) বললেন : অন্তরের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন, আপনার দাবি সত্য হলে আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। তবে বাহ্যিক অবস্থার বিচারে আপনাকে কোনো প্রকার সুবিধা দেয়া যাবে না। আর মুক্তিপণ আদায়ে আপনার অক্ষমতাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমি জানি, মক্কার উম্মুল ফজলের কাছে আপনি মোটা অঙ্কের অর্থ রেখে এসেছেন।

রাসূলের এ কথা শুনে আব্বাস বিস্ময়ের সাথে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ও উম্মুল ফজল ছাড়া আর কেউ এই অর্থের কথা জানে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি আল্লাহর রাসূল।

সত্যি সত্যিই তিনি নিজের, ভ্রাতুষ্পুত্র আকীল এবং নাওফিল ইবন হারিসের পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আব্বাস সপরিবারে মদীনায় হিজরত করলেন। রাসূলের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। সেই সাথে তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু করলেন।

হযরত আব্বাস।– সেই আব্বাস এখন বদলে গেছেন সম্পূর্ণ। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার পুরো জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের জন্য। মক্কা বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হুনাইনের অভিযানে রাসূলের (সা) সাথে একই বাহনে আরোহী ছিলেন তিনি।

কী সৌভাগ্য তার! বাহনের পিঠে বসেই তিনি বললেন : এ যুদ্ধে কাফেরদের জয় হলো এবং মুসলিম মুজাহিদরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো!

রাসূল (সা) বললেন : 'আব্বাস! তীরন্দাজদের আওয়াজ দাও।'

আব্বাস আওয়াজ দিলেন জোরগলায় : 'তীরন্দাজরা কোথায়? কোথায় তোমরা!...'

কী আশ্চর্য! আব্বাসের এই তীব্র আওয়াজের সাথে সাথেই ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়। শুধু হুনাইন নয় তায়েফ অবরোধ, তাঁবুক অভিযান এবং বিদায় হজ্জেও অংশ নিয়েছিলেন দুঃসাহসী আব্বাস। দুঃসাহসী! কিন্তু তিনিই আবার সত্যের পক্ষে কোমল। কোমল এবং বিনয়ী।

আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও দয়ালু এক অসামান্য

www.amarboi.org

সোনার মানুষ। তাঁর সম্পর্কে হযরত সাদও বলেছেন : আব্বাস হলেন আল্লাহর রাসূলের চাচা, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাধিক দরাজ দিল এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অধিক মনোযোগী। তিনি ছিলেন কোমল অন্তরবিশিষ্ট। দোয়ার জন্য হাত উঠালেই তার দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তো কেবল অশ্রুর বন্যা। এই কারণে তার দোয়ার একটি বিশেষ ফলও লক্ষ্য করা যেত।

আর মর্যাদার দিক দিয়ে? মর্যাদার দিক দিয়ে আব্বাস ছিলেন অসাধারণ। স্বয়ং রাসূলে করীমও (সা) চাচা আব্বাসকে খুব সম্মান করতেন। তার সামান্য কষ্টতেই দুঃখ পেতেন দয়ার নবী (সা)।

একবার কুরাইশদের একটি রূঢ় আচরণ সম্পর্কে রাসূলের কাছে আব্বাস অভিযোগ করলে রাসূল ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন : 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আপনাদের ভালোবাসে না, তার অন্তরে ঈমানের নূর থাকবে না।'

হযরত আব্বাসকে এমনই ভালোবাসতেন আর শ্রদ্ধা করতেন রাসূল। কী অতুলনীয় রাসূলের সেই ভালোবাসা আর সম্মানের নিদর্শন!

একবার রাসূল (সা) একটি বৈঠকে কথা বলছেন হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের (রা) সাথে। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হযরত আব্বাস। চাচাকে দেখেই রাসূল (সা) তাকে নিজের ও আবু বকরের মাঝখানে বসালেন। আর তখনই রাসূল তাঁর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে কথা বলা শুরু করলেন।

আব্বাস চলে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সা)! এমনটি করলেন কেন?

রাসূল (সা) বললেন : 'মর্যাদাবান ব্যক্তিই পারে মর্যাদাবানের মর্যাদা দিতে।'

তিনি আরো বললেন : 'জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেছেন, আব্বাস উপস্থিত হলে আমি যেন আমার কণ্ঠস্বর নিচু করি, যেমন আমার সামনে তোমাদের স্বর নিচু করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।'

রাসূলে কারীমের (সা) পর, পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনও হযরত আব্বাসের মর্যাদা এবং সম্মানের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক।

www.amarboi.org

হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আব্বাসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন। বলতেন, 'ইনি হচ্ছেন রাসূলের (সা) চাচা।' হযরত আবু বকর একমাত্র আব্বাসকেই নিজের আসন থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিতেন।

হযরত আব্বাস!

সাগর সমান এই মর্যাদা আর সম্মান কি তার এমনিতেই এসেছে? এই মর্যাদা অর্জন করতে গিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে ঈমানের বিশাল দরিয়া। আর টপকাতে হয়েছে তার একের পর এক আগুন এবং ধৈর্যের উপত্যকা।

বৈরী বাতাসে সাঁতার কেটেই তো এক সময় পৌঁছানো যায় প্রশান্ত, নির্ভরতা এবং আলোর উপকূলে! আর এমনি সফল আলোকিত মানুষ দেখে দুনিয়া এবং আখেরাত– হাসে দরিয়ার দুই কূল। রাসূলকে (সা) ভালোবেসেই তারা হয়েছিলেন মহান।

আমরাও হতে চাই তেমনি।■

www.amarboi.org

আলোর খোঁজে বহুদূর

গ্রামটির নাম 'জায়ান'।

পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের একজন ধনাঢ্য পিতার ঘরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে একটি শিশু।

প্রকৃতির আলো-হাওয়ায় বাড়তে থাকে শিশুটি। বাড়তে বাড়তে হয়ে যায় নওজোয়ান।

রাজপুত্রের মতো সুন্দর ফুটফুটে নওজোয়ানকে সবচেয়ে ভালোবাসে তার পিতা।

তিনি গ্রামের সর্দার। একমাত্র পুত্র তার নয়নের মনি। কলিজার টুকরা। পিতা চান না ছেলের অমঙ্গল। চান না কোনো রকম বিপদ তার ছেলেকে স্পর্শ করুক। এজন্যে তিনি ছেলেকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রাখেন।

www.amarboi.org

নওজোয়ান ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকে সারাক্ষণ।

খাঁচার পাখির মতো তার হৃদয়ে দুলে ওঠে মুক্তির দুর্বার ঢেউ।

সে মুক্তি পেতে চায়। পেতে চায় মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া। দেখতে চায় চাঁদ জোছনা আর প্রকৃতির নির্মল শোভা।

দিন যায় মাস যায়! নওজোয়ানের প্রতীক্ষার প্রহর বাড়তে থাকে। কিন্তু মুক্তির সুযোগ আর আসেনা।

অবশেষে একদিন এলো।

তার পিতার ছিলো বিশাল খামার। তিনি সেদিন নিজে আর খামারে যেতে পারলেন না। আদরের ছেলেকে বললেন,

আমিতো আজ খামারে যেতে পারছিনে। তুমিই যাও। কাজকর্ম একটু দেখাশুনা করে এসো।

পিতার কথা শুনে নওজোয়ানের বুকে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। আবদ্ধ ঘর থেকে সে বের হয়ে আসে। দু'চোখ ভরে দেখে পাখির ঝাঁক। ফুলের শোভা। সবুজ প্রকৃতি। নিঃশ্বাসে টেনে নেয় বুকের ভেতর শীতল হাওয়া।

আহ! মুক্তির স্বাদই আলাদা!

নওজোয়ান হাঁটছে মনের আনন্দে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে চার পাশের সবুজ গাছ-গাছালি গুল্মলতা। শুনছে পাখির কলরব। দেখছে আকাশে মেঘের খেলা। দেখছে আর ভাবছে। ভাবছে আর হাঁটছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। ওপাশে কাদের আওয়াজ?

গুন গুন করে কথা বলছে কারা?

নওজোয়ান কান খাড়া করে শুনতে থাকে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে সেই ঘরটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আবারও তার কানে ভেসে এলো প্রার্থনার শব্দ।

ঘরটি শুধু ঘর নয়। একটি গীর্জা। এখানে খ্রিস্টানরা উপাসনা করে।

নওজোয়ান তো আর এদের উপাসনার খবর জানে না। তার পিতা একজন বিখ্যাত অগ্নি-উপাসক। পিতার কাছ থেকে সে আগুনের উপাসনাই শিখেছে।

www.amarboi.org

গীর্জার লোকদের কাছে নওজোয়ান জিজ্ঞেস করলো তোমরা এখানে কি করছো?

আমরা প্রভুর প্রার্থনা করছি। তারা জবাব দিল।

তাদেরকে দেখে নওজোয়ান খুশি হলো। তার হৃদয়ে অন্যরকম হাওয়া বইতে থাকলো। সে ভুলে গেল খামারে যাবার কথা।

ভুলে গেল পিতার নির্দেশ। সারাদিন সে কাটিয়ে দিল তাদের সাথে গীর্জায়।

বেলা বাড়তে থাকে। একসময় দিনের সূর্য হারিয়ে যায়।

নেমে আসে সন্ধ্যার কালো ছায়া। নওজোয়ানের মনে পড়ে বাড়ি ফেরার কথা। ফেরার সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধর্মের উৎস কোথায়?

গীর্জার লোকেরা বললো– শামে।

ক্লান্ত। অথচ প্রশান্ত নওজোয়ান। চোখে মুখে আনন্দের ফোয়ারা।

পিতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খামারে গিয়েছিলে? কেমন দেখলে?

নওজোয়ান মিথ্যে বললো না। বললো, খামারে না গিয়ে সারাদিন গীর্জায় থেকে উপাসনা করেছি।

সর্দার পিতা ছেলের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন। তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা ছুটছে।

ছেলে আগুনের উপাসনা না করে গীর্জায় উপাসনা করেছে! ধর্মান্তরিত হচ্ছে!

পিতা ভুলে গেলেন স্নেহের কথা। আদরের কথা। তিনি নিষ্ঠুরভাবে ছেলের পায়ে বেড়ি দিয়ে পুনরায় ঘরে আবদ্ধ করে রাখলেন।

আবদ্ধ ঘরে হাওয়া ঢোকেনা।

ছেলেটি কাঁদে মুক্তির প্রার্থনা করে।

খ্রিস্টানদের কাছে গোপনে খবর পাঠায়। শামের দিকে যদি কোনো কাফেলা যায় তাহলে তাকে যেন কৌশলে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

খ্রিস্টান ধর্মের মূল উৎস শামে। সেও শামে যাবে। সেখানে গিয়েই তার হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করবে।

কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। সে পায়ে বেড়ি নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। কেবলই প্রতীক্ষা করে– কখন আসবে সেই সোনালি সুযোগ?

www.amarboi.org

একদিন সুযোগ এলো।

রাতের গভীরে নওজোয়ানকে উদ্ধার করে একটি কাফেলা তাকে নিয়ে গেল শামে।

নতুন শহর শাম। নওজোয়ানের চোখে মুখে অবাক- বিস্ময়। সে জিজ্ঞেস করলো, এখানকার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তারা জবাব দিল- বিশপ। গীর্জার পুরোহিত।

নওজোয়ান তার কাছে গেল।

পুরোহিতের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিল। পুরোহিতকে সে ভালো করে দেখতে থাকলো। তার স্বভাব, তার চরিত্র, তার আচরণ-সবকিছু। তাকে দেখে আর তার সাথে থেকে নওজোয়ানের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার বুকে জমে উঠলো ঘৃণা ও কষ্টের মেঘ।

সবাই যাকে ভালো মানুষ বলে জানে- আসলে সে আদৌ ভালো মানুষ ছিলো না।

তার ছিলো লোভ আর মিথ্যার ছলনা। সে সবাইকে সওয়াবের লোভ দেখিয়ে দান খয়রাত করতে বলে। পুরোহিতের কথায় সবাই দান করে অঢেল টাকা। অনেক স্বর্ণ। অনেক সম্পদ। পুরোহিত এসব দানের সম্পদ গচ্ছিত রাখে তার গোপন গুদামে। আর সেসব সম্পদ এবং অর্থ নিজেই আত্মসাৎ করে।

পুরোহিত মারা গেলে তার ভক্তরা তাকে দাফন করতে এলো।

নওজোয়ান সবাইকে বললো- এ পুরোহিত ভালো মানুষ ছিলো না। তোমাদের দানের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেই ভক্ষণ করেছে আর জমা করে রেখেছে গোপন গুদামে।

সত্যি বলছো? তা হতেই পারে না। উনি আমাদের বিশপ। আমাদের পুরোহিত। এমন কাজ তার পক্ষে কি করা সম্ভব?

নওজোয়ান গোপন গুদামে তাদেরকে নিয়ে গেল। তারা দেখলো গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়।

এমন ভণ্ড তাপসকে কি দাফন করা যায়?

তারা তাদের বিশপের লাশকে ঘৃণায় আর ক্ষোভে শূলে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখলো।

www.amarboi.org

মানুষ দেখুক– ভণ্ডামির এবং পাপের কি সাজা!

ভণ্ড বিশপের মৃত্যুর পর এলো আর একজন বিশপ। নওজোয়ান তার সেবা করা শুরু করলো। বিশপের মৃত্যুর সময় সে জিজ্ঞেস করলো–

আপনার মৃত্যুর পর আমি আর কার কাছে যেতে পারি? কে সবচেয়ে সত্যবাদী পুরুষ? বেশী ধর্মভীরু?

বিশপ বললো, মাওসেলে এক ব্যক্তি আছেন। তার নামও তোমাকে বললাম। তিনি অপেক্ষাকৃত ভালো এবং সৎ মানুষ। তুমি তার কাছে যেতে পারো।

বিশপের মৃত্যুর পর নওজোয়ান মাওসেল গেল। খুঁজে বের করলো লোকটিকে। তাকে দেখে নওজোয়ানের ভালো লাগলো। শ্রদ্ধা করার মতো ব্যক্তি বটে! কিন্তু তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। নওজোয়ান তাকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করে।

একদিন বৃদ্ধের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। নওজোয়ান কেঁদে ফেললো। এবার আমি কার কাছে যাবো?

বৃদ্ধ দুঃখভরা হৃদয়ে বললেন, তোমার সত্য সন্ধানের নেশা আমাকে মুগ্ধ করেছে যুবক! তোমার মতো এতো ভালো– উৎসাহী ব্যক্তি আমি আর পাইনি। নসিব মন্দ! আমি বিদায় নিচ্ছি। আমরা যে বিশ্বাসের ওপর অটল ছিলাম, এখন আর তেমন কোনো সত্যপুরুষ এ ধর্মে নেই। তবু তুমি আমার মৃত্যুর পর নাসসিবীনে যেতে পারো। সেখানে এক ব্যক্তি আছেন এই নামের লোকটির কাছে তুমি থাকতে পারো।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর নওজোয়ান সত্য সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করে নাসসিবীনের দিকে।

বহু কষ্ট করে সে পৌঁছলো সেখানে। খুঁজে বের করলো তাকে।

অল্প দিনের মধ্যে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। নওজোয়ান বললো, এবার আমি কার কাছে যাবো?

তিনি বললেন আম্মুরিয়াতে এক ব্যক্তি আছেন। তুমি তার কাছে যেতে পারো।

নওজোয়ান আম্মুরিয়ার সেই ধার্মিকের কাছে গেল।

www.amarboi.org

নওজোয়ানের মুখে তার অতীতের ত্যাগ এবং সত্য সন্ধানের কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। তাকে কিছু গরু এবং ছাগল প্রদান করলেন।

নওজোয়ানের বুকটা ফুলে উঠলো আনন্দে। মনে পড়লো তার পিতার ঐশ্বর্যের কথা। সম্পদের কথা। কত আদর যত্নে সে পালিত হয়েছে– সে কথা।

কিন্তু সত্য ধর্মের প্রতি হৃদয়ের দুর্বার টানে মুহূর্তে সে ভুলে গেল পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধির কথা।

নওজোয়ান হৃদয়-মন ঢেলে দিয়ে সেবা করে যায় বৃদ্ধকে।

কিন্তু বার্ধক্যের তো আর কোনো ঔষধ হয়না!

মৃত্যুকে তো কেউ আর ফেরাতে পারে না।

ঝরে পড়ার সময় হলে গাছের পাতা যেমন ঝরে যায়, তেমনি– মৃত্যু আসলেই তাকে মৃত্যুমুখে সমর্পিত হতে হয়। এর কোনো বিকল্প নেই।

দিনে দিনে বৃদ্ধও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

নওজোয়ানের চোখে বিষাদের কালো ছায়া। এবার সে কোথায় যাবে?

নওজোয়ানের উৎকণ্ঠা দেখে বৃদ্ধ তাকে কাছে ডাকলেন। আদরে আদরে ভরে দিলেন যুবকের হৃদয়। তারপর আস্তে করে বললেন,

আমি জানিনে– এরপর তুমি কোথায় যাবে। আমিতো তেমন কোনো ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাচ্ছিনে। যার কাছে তোমাকে পাঠানো যায়। আমরা যে ধর্মের ওপর আস্থাশীল ছিলাম, যে সত্যের ওপর সুদৃঢ় ছিলাম, এখন আর তার ওপর তেমন কোনো সৎব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। নেই কোনো সত্য পুরুষ। তবে হতাশ হবার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে আরবে একজন ব্যক্তি আসবেন। তিনি নবী। ইবরাহীমের ধর্মকে তিনি নতুনভাবে প্রচার করবেন। তাঁর ওপর আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তিনি বড় বড় পাথরের জমিনের মাঝখানে খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। নবুওয়তের নিদর্শন থাকবে তাঁর কাছে। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে থাকবে নবুওয়তের মোহর। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী। সত্যনবী। মহা সম্মানী এই নবী হাদিয়ার জিনিস খাবেন। কিন্তু সাদকার জিনিস তিনি কখনোই খাবেন না। সম্ভব হলে তুমি সেখানে যেতে পারো। তাঁর কাছ

www.amarboi.org

থেকে পান করতে পারো সত্য পিপাসার অঢেল পানি। তোমার যাবতীয় তৃষ্ণা মিটে যাবে তখন।

বৃদ্ধ মারা যাবার পর নওজোয়ান সিদ্ধান্ত নিল আরবে যাবার। কালব গোত্রের কিছু আরব ব্যবসায়ী আম্বুরিয়াতে এলো। নওজোয়ান বললো, আমার এই গরু ছাগলগুলো তোমাদেরকে দেব। বিনিময়ে আমাকে তোমরা আরবে নিয়ে যাবে?

তারা রাজি হয়ে গেল। যুবক চললো তাদের সাথে।

সুদূর আরবে।

কিন্তু লোকগুলো ছিলো অসৎ, বিশ্বাসঘাতক।

পথিমধ্যে তারা তাকে বিক্রি করে দিল এক ইহুদীর কাছে।

ধনীর ঘরের আদরের সন্তান শুরু করলো দাসত্বের জীবন। আর দাসত্বের জীবন মানেই তো কষ্টের জীবন।

আগুনের জীবন!

অল্পদিনের মধ্যেই হাত বদল হলো যুবক।

বনী কুরাইজা গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে কিনে নিল। তারপর তাকে নিয়ে গেল ইয়াসরিবে (মদীনায়)।

মদীনায় এসে নওজোয়ান চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

সবকিছু অচেনা অজানা।

কোথাওবা পাহাড় পর্বত। আবার কোথাওবা পাথর কুঁচির বিস্তীর্ণ ভূমি। তারই মধ্যে আবার খেজুরের সুন্দর সাজানো বাগান।

মুহূর্তেই মনে পড়লো তার আম্বুরিয়ার বৃদ্ধের কথা। বৃদ্ধের দেয়া নির্দেশের মধ্যে একটি ছিলো– খেজুরের বাগান।

খেজুরের বাগান দেখে নওজোয়ানের প্রাণে আনন্দের মৌমাছি গুন গুন করে উঠলো। মনিবের সাথে সে এখানে অবস্থান করলো।

মন দিয়ে সে মনিবের কাজ করে যায়। তার কাজে কোনো ফাঁকি নেই। সততা আর শ্রমে নেই কোনো চালাকি।

নওজোয়ান খেজুর বাগানে। খেজুর গাছের চূড়ায় উঠে কাজে ব্যস্ত।

www.amarboi.org

মনিব গাছের নিচে বসে আরামে বিশ্রাম করছে।

এমন সময় মনিবের ভাতিজা এসে বললো, মক্কা থেকে আজ এক ব্যক্তি এসেছে ইয়াসরিবে। বনী কায়লারা তাঁর কাছে ছুটে গেছে।

লোকটি নিজেকে 'নবী' বলে দাবি করছে। লোকটির কথা কানে যেতে না যেতেই নওজোয়ান চমকে উঠলো।

তার হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ বেড়ে গেল। মনে পড়লো– বৃদ্ধের কথা।

এ কি তাহলে সেই নবী! যিনি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন?

গাছ থেকে নেমে এলো সে।

জিজ্ঞেস করলো তার কাছে– তুমি কি বললে? আর একবার বলো তো?

দাসের জিজ্ঞাসায় মনিব রেগে গেল। তার গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিয়ে বললো, তোমার তাতে কি হে?

মনিবের চড়ের আঘাতেও দমে গেল না দাস। বৃদ্ধের কথা মতো সে মক্কা থেকে আগত লোকটি পরীক্ষা করতে চাইলো। সত্যিই তিনি নবী কিনা।

সন্ধ্যার পর নওজোয়ান কিছু খেজুর নিয়ে মক্কা থেকে আগত লোকটির কাছে গেল। খেজুরগুলো তাঁকে দিয়ে বললো,

শুনেছি আপনি পুণ্যবান ব্যক্তি। আমার কাছে কিছু সদকার জন্যে খেজুর আছে। এগুলো আপনি গ্রহণ করুন।

লোকটি খেজুরগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন– তোমরা খাও।

আশ্চর্য! তিনি নিজে একটি খেজুরও খেলেন না।

নওজোয়ান প্রথম পরীক্ষায় সত্যের সাফল্যে আনন্দিত হলো।

তার বিশ্বাসের ভীত শক্ত হয়ে উঠলো– ইনি সত্যিই সেই নবী। যার কথা বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষাটিও করা প্রয়োজন।

একদিন– বাকী আলগারকাদ গোরস্তানে নবী (সা) তাঁর এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। তাঁর গায়ে ছিলো এক ধরনের ঢিলা পোশাক।

যুবকটি সেখানে গেল। নবীকে দেখতে থাকলো। খুটিয়ে খুটিয়ে। ভালো করে। যুবকটি নবীর কাঁধের দিকে বারবার তাকাতে থাকলো। খুঁজতে থাকলো তার প্রার্থিত নমুনাটি।

www.amarboi.org

যুবকটির উৎসাহ নবীর (সা) দৃষ্টিগোচর হলো।

তিনি বুঝলেন– সে কি দেখতে চায়।

নবীজী নিজের পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন। আর সাথে সাথেই বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো নবুওয়তের মোহরটি।

নওজোয়ান বিশ্বাসের সমুদ্রে নেমে যায়। আনন্দে দিশেহারা হয়ে সে নবীজীর মোহরটি চুমুতে চুমুতে ভরে দেয়।

তার দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। সে পানি বিষাদের নয়, বিশ্বাসের।

আনন্দের।

পাওয়ার তৃপ্তিতে ভরে উঠলো তার তৃষিত হৃদয়ের দু'কূল।

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন– তোমার পরিচয়?

নওজোয়ান তার পরিচয় দিল। সেই সাথে বললো তার পেছনের সকল কথা।

সব শুনে নবীজী খুশি হলেন। আনন্দিত হলেন।

তিনি সঙ্গী– সাথীদেরকে বললেন– নওজোয়ানের জীবনের কথা। তার সত্য অনুসন্ধানের কথা। তার ত্যাগের কথা।

নবীর (সা) সঙ্গীরা সে কথা শুনে খুব খুশি হলেন।

নবীজীর পরামর্শে একদিন দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পেল নওজোয়ান। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে।

মুক্তির পর নবীজীর সাথে থেকেই কাটিয়ে দেন সারাটি জীবন।

সত্যের আলোতে গড়ে তোলেন নিজের জীবন।

দাসত্ব জীবনের কারণে তিনি বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই না পারার কারণে তার বুকে জমে থাকে কষ্টের কুয়াশা।

বেদনার বৃষ্টি ঝরতে থাকে অষ্ট প্রহর।

এরপর এলো খন্দকের যুদ্ধ। নওজোয়ান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রাজ্ঞ। তিনি পরামর্শ দিলেন এই যুদ্ধে পরিখা খননের জন্য। নবীজী তার এই সুন্দর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

খন্দকের যুদ্ধে খনন করা হলো পরিখা।

www.amarboi.org

আদরে আদরে বেড়ে ওঠা এক যুবক।

সত্য গ্রহণের জন্যে ত্যাগ করেছেন জীবনের যাবতীয় সুখ। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের প্রতি তার ছিলো না এতটুকু মোহ। তাইতো তিনি বসবাসের জন্যে তৈরি করেননি কোনো সুন্দর ঘর। বানাননি বিলাসের সামগ্রী।

অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি।

তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত অর্থেই মুসাফির।

মুসাফিরের মতোই ছিলো তার জীবন যাপন, কিন্তু আখেরাতের প্রতি ছিলো তার অবিচল আস্থা।

আল্লাহর প্রতি ছিলো পর্বতের মতো সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নবীজীর প্রতি ছিলো অসীম ভালোবাসা।

নওজোয়ানের বয়স বাড়তে থাকে।

বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা রাখলেন তিনি। ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে।

অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত তিনি।

তিনি কাঁদছেন। তার দু'গণ্ড ভিজে যাচ্ছে অশ্রুধারায়।

হযরত সা'দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– আপনি কাঁদছেন কেন? রাসূল (সা) তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হাউজে কাউসারের কাছে আপনি রাসূলের সাথে মিলিত হবেন।

তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছিনে।

তবে?

তিনি বললেন– রাসূল (সা) আমাদেরকে মুসাফিরের মতো চলতে বলেছিলেন। অথচ আমার কাছে অনেক জিনিসপত্র জমা হয়ে আছে।

সেই জিনিসগুলো আর কিছু নয়। মাত্র একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র। সত্য সন্ধানী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং আত্মত্যাগী এই দুঃসাহসী মুসাফিরের নাম সালমান আল ফারসী।

সত্যের আলোর খোঁজে যিনি ছুটেছেন অনন্ত জীবন– দিক থেকে দিগন্তে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।■

www.amarboi.org

আলোর মিছিল

সূর্য ডুবে গেছে।...

সত্য আর সুন্দর হয়েছে নির্বাসিত।

চারদিক থক থক করছে জমাট বাধা অন্ধকার।

জাহেলিয়াতের সয়লাবে ভেসে গেছে আরবের সকল সমাজ।

মানুষের চোখে আশা নেই। স্বপ্ন নেই। নেই মুক্তির দিশা।

ঠিক এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন মানবতার মহান পুরুষ– নবী মুহাম্মাদ (সা)।

তখনো নবুওয়তপ্রাপ্ত হননি হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

আল্লাহ্ পাক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে সম্মানিত করবেন।

রাসূল (সা) লোকালয় ছেড়ে চলে যেতেন মক্কার পার্বত্য উপত্যকা ও সমভূমিতে।

www.amarboi.org

রাসূল যে পথ দিয়ে হাঁটতেন সেই পথের দু'পাশ থেকে পাথর এবং বৃক্ষলতা সমস্বরে বলে উঠতো–

"আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।"

"হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালাম।"...

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান রাসূল ডানে এবং বামে।

সামনে এবং পেছনে। না, কেউ নেই।

বৃক্ষ ছাড়া, পাথর ছাড়া, পাহাড় পর্বত, উট এবং মেষের পাল আর মরুভূমির উত্তপ্ত বালু ছাড়া চারপাশে কেউ নেই।

কারুর অস্তিত্ব খুঁজে পান না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তবু, তবু এ কিসের শব্দ? কার পক্ষ থেকে এ কোন্ অলৌকিক ধ্বনি?

বিস্ময়ে চমকে ওঠেন নবী মুহাম্মাদ (সা)!

এভাবে কেটে গেল কিছু দিন।

রাসূল ভাবেন আনমনে। একান্তে। নির্জনে।

চিন্তা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় মক্কা থেকে কিছু দূরে– হেরা গুহায়।

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন রাসূল।

তিনি ভাবেন– বিশ্বজাহান এবং জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে।

কে? কে সৃষ্টি করেছেন আমাকে? এই– আকাশ, পৃথিবী, এই সুন্দর প্রকৃতি আর এই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার প্রকৃত মালিক কে?

কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসার ঢেউ আছড়ে পড়ছে নবীজীর কোমল হৃদয়ে।

রমযান মাস।

রাসূল হেরা গুহায় একাকী। ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন এক আলোকিত ফেরেশতা– হযরত জিবরাঈল। তাঁর হাতে একখণ্ড রেশমি কাপড়। তাতে লেখা ছিলো কিছু। কাপড়টি রাসূলের সামনে তুলে ধরে জিবরাঈল বললেন–

'ইক্বরা'!... পড়ুন।

অবাক মুহাম্মাদ! কাঁপাস্বরে বললেন, 'আমিতো পড়তে জানিনা।'

www.amarboi.org

জিবরাঈল এবার চেপে ধরলেন নবী মুহাম্মাদকে (সা)। বললেন, 'পড়ুন'।

তৃতীয়বার চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন জিবরাঈল–

'ইক্বরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'।...

"পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব অতীব অনুগ্রহশীল। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সবকিছু শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না।" [আল আলাক]

চলে গেলেন হযরত জিবরাঈল। থরথর করে কেঁপে উঠলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)!

এ কিসের আওয়াজ? কিসের শব্দ?

এটাই মহান রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী মুহাম্মাদের কাছে প্রথম বাণী। প্রথম ওহী।

প্রথম ওহীর ছয় মাস পর।

কোথাও যাচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

হঠাৎ ওপরের দিকে ধ্বনিত হলো– একটি আওয়াজ।

ভীষণ আওয়াজ! মাথা তুলে ওপরে তাকালেন হযরত। দেখলেন জিবরাঈলকে। যার ডানাগুলো ছিলো আদিগন্ত বিস্তৃত।

এই দৃশ্য দেখে আবারো কেঁপে উঠলেন তিনি। দ্রুত ফিরে এলেন বাড়িতে।

খাদিজাকে (রা) ডেকে বললেন, "যাম্মিলূনী, যাম্মিলূনী"।

কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো নবী মুহাম্মাদকে (সা)।

এই অবস্থার মধ্যেই জিবরাঈল আবার চলে আসেন নবীর (সা) কাছে এবং পৌঁছে দেন দ্বিতীয় ওহীর বাণী–

"ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্‌সির। কুম ফা আনজির..."

ওহে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো। লোকদের সাবধান করো এবং তোমার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো। তোমার পোশাক পাক সাফ করো। মলিনতা থেকে দূরে থাকো এবং বেশী পাওয়ার জন্য ইহসান করোনা। তোমার রবের খাতিরে ধৈর্য অবলম্বন করো।" [আল মুদ্দাসসির]

www.amarboi.org

দ্বিতীয় ওহীতে স্পষ্ট হলো রাসূলের (সা) কাছে– মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে হবে।

তাদের কাছে মহান রাব্বুল আ'লামীনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতা।

ওহীর এই মর্মবাণী বুঝার পর নবী মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর নির্দেশে শুরু করলেন দাওয়াতের কাজ। ইসলাম প্রচারের কাজ।

প্রথমে শুরু করলেন নিজের ঘর থেকে।

তারপর পড়শীর ভেতর। ঘনিষ্ঠ জনদের মধ্যে। চুপে চুপে। গোপনে।

রাসূলের (সা) ডাকে সাড়া দিলেন বেশকিছু মর্দে মুজাহিদ। যারা জান-মাল এবং সকল কিছুর বিনিময়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পর্বত সমান।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এলো প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ।

সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদেরকে ডাকলেন রাসূল–

'ইয়া সাবাহা!'...

রাসূলের (সা) সংকেতন বাণী শুনে ছুটে এলো তারা। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন–

'হে ধ্বংস পথের যাত্রীদল! হুঁশিয়ার হও। এখনো সময় আছে। এখনো পথ আছে। ফিরে এসো আলোর পথে। সুন্দরের পথে। ইবাদত করো এক আল্লাহর। পবিত্র করো অন্তরকে। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়লো রাসূলের দাওয়াত। খেজুরের বাগান থেকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তৃষিত তৃষিত শ্রমিক।

'কে যায়, কে যায়? প্রদীপ হাতে কে যায়, ওগো কারা?'

আলোর মিছিল নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

তাঁর মিছিলে একে একে যোগ দেন– চিন্তাশীল সত্যানুরাগী মানুষ। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষ। লাঞ্ছিতা নারী।

www.amarboi.org

আলোর পরশ পেয়ে তারাও হয়ে উঠলো খাঁটি। সত্য মানুষ। এভাবে দলে দলে লোক ছুটে আসে সেই আলোকিত মিছিলের দিকে। রাসূলের (সা) দিকে। সত্যের দিকে।

কিন্তু ততোক্ষণে জ্বলে উঠেছে আবু জেহেলের বুক।

প্রতিশোধের আগুন লক লক করে উঠছে কাফেরদের চোখে মুখে।

শুরু হলো অত্যাচার!

একে একে শহীদ হলেন হারেস ইবনে আবিহালা, ইয়াসির, খোবাইব প্রমুখ সাহাবী।

শুধু পুরুষ নয়, রাসূলকে ভালোবেসে হাসতে হাসতে খোদার পথে শহীদ হলেন দুঃসাহসী এক মহিলা– হযরত সুমাইয়া।

ইসলাম প্রচারের একেবারেই প্রথম দিকের কথা।

তখন যারা ইসলাম কবুল করতেন, তাদের ওপর কাফেররা চালাতো অকথ্য নির্যাতন।

তাদের অত্যাচারে কেঁপে উঠতো আল্লাহর আরশ। ভারী হয়ে উঠতো বাতাসের বুক। থেমে যেত পাখির কলরব।

কিন্তু ঈমানের পরীক্ষায় তারা হতেন উত্তীর্ণ।

এমনি একজন সফল মায়ের নাম– হযরত সুমাইয়া।

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশদের হাতে শহীদ হয়ে গেছেন তাঁর স্বামী– হযরত ইয়াসির।

শহীদ হয়েছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র– হযরত আবদুল্লাহ।

এবার কাফেরদের হিংস্র চোখ পড়লো সুমাইয়ার ওপর। লোহার পোশাক পরিয়ে সুমাইয়াকে তারা দাঁড় করিয়ে দিত মরুভূমির ঠা ঠা রোদের ভেতর। উত্তপ্ত বালুর ওপর।

পানি পানি।... বলে চিৎকার করলেও নরপশুরা এক ফোঁটা পানি দিতনা তাঁকে।

তখনো ঈমানের ওপর পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন হযরত সুমাইয়া।

ক্ষিপ্ত কুরাইশ!

www.amarboi.org

অবশেষে বর্শার আঘাতে আঘাতে তারা ঝাঝরা করে দিল হযরত সুমাইয়ার পবিত্র শরীর। আর এভাবেই তিনি পান করলেন শহীদী পেয়ালা।

হযরত খাব্বাবের কথা কে না জানে?

তাঁর ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তা দেখে শিউরে উঠেছিল সমগ্র জাহান। থেমে গিয়েছিল উটের বহর। ছলছল করে উঠেছিল প্রকৃতির চোখ।

শুধু একজন খাব্বাব নয়।

কত যে খাব্বাব এভাবে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের জীবন। একমাত্র নবীকে (সা) ভালোবেসে। আল্লাহকে ভালোবেসে। আল্লাহর দীনকে ভালোবেসে।

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর।

সাফা থেকে বের হলো মুসলমানদের একটি মিছিল।

ইসলামের পক্ষে প্রথম মিছিল। মিছিলের দুই লাইনের সামনে ছিলেন হযরত হামযা (রা) এবং হযরত ওমর (রা)। আর উভয়ের মাঝে ছিলেন স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)।

কাবায় গিয়ে শেষ হলো মিছিলটি।

মিছিলের সবার মুখে সেদিন উচ্চারিত হলো এক অনুপম ধ্বনি–

'আল্লাহু আকবার।'...

কিন্তু তারপর–

তারপর মুশরিকদের অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল শতগুণে। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু মুসলিম হাবশায় চলে যেতে বাধ্য হলেন।

নবুওয়তের ৭ম বছর। মক্কার সকল গোত্র সমাজ থেকে বয়কট করলো বনু হাশিম গোত্রকে। তাদের সাথে সকলের লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে গেল। কেটে গেল এভাবে মাসের পর বছর। তাদের কাছে যে খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিলো, একদিন তাও ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা গাছের পাতা খেতে শুরু

www.amarboi.org

করলেন। গাছের পাতাও একদিন শেষ হয়ে গেল। তখন তারা গাছের ছাল খাওয়া শুরু করলেন। গাছের ছালও এক সময় শেষ হয়ে গেল। তাদের তাঁবুগুলো ছিলো উটের চামড়ার তৈরি। ক্ষুধার জ্বালায় তারা তাঁবুর এক একটি অংশ ছিঁড়ে সেই উটের চামড়া চিবিয়ে খেতে শুরু করলো। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। ক্ষুধায় মারা গেলেন অনেকে।

এভাবে তারা অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তিনটি বছর।

নবুওয়তের নবম বছর।

মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার আর উৎপীড়নে অস্থির হয়ে উঠলো সাধারণ মানুষ। রাসূল (সা) ভাবলেন, এখানে আর নয়।

এবার যেতে হবে তায়েফ। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি যাত্রা করলেন তায়েফের দিকে।

মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে তায়েফ।

সবুজ-সুন্দর তায়েফের প্রকৃতি। কিন্তু সেখানে গিয়েও সুস্থির হতে পারলেন না নবী মুহাম্মাদ (সা)। রাসূল তাদেরকে ডাকেন– হে তায়েফবাসী! তোমরা চলে এসো আলোর পথে। চলে এসো সত্যের পথে। আল্লাহর পথে। রাসূলের দিকে।

অবোধ তায়েফবাসী! তারা শুনলো না নবীর (সা) কথা।

তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বরং তায়েফবাসীরা নবীর ওপর চালালো অকথ্য নির্যাতন। তাদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)! তবুও দয়ার নবী দু'হাত তুলে দোয়া করলেন তাদের জন্য।

শত অত্যাচার আর আঘাতেও হতাশ হলেন না নবী মুহাম্মাদ (সা)। হতাশ হলেন না তাঁর প্রিয় সাথীরা।

কিছুদিন পর।

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেল মদীনায়।

মদীনা থেকে কুবা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেল ইসলামের আহ্বান। প্রথমে চারজন মদীনাবাসী মুহাম্মাদের (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করলেন বাহাত্তর জন।

www.amarboi.org

ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য মক্কার পরিবেশ চলে গেল প্রতিকূলে। আর ধীরে ধীরে মদীনার পরিবেশ হয়ে উঠলো উর্বর।

মদীনার মানুষ ছিলো ইসলামের জন্য উন্মুখ। ফলে রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত নিলেন মদীনায় হিজরত করার।

রাসূল হিজরত করলেন মদীনায়। পেছনে পড়ে রইলো তাঁর আপন জন্মভূমি মক্কা।

পড়ে রইলো চেনা-জানা মরুপথ, খেজুরের বাগান, পাহাড়, উপত্যকা আর মরুভূমি-মরুদ্যান।

বারবার তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে তাকান মক্কার দিকে। প্রিয় জন্মভূমির দিকে।

রাসূলের (সা) বিদায়ে কেঁদে উঠলো মক্কার উট, ভেড়া আর মেষের পাল। পাথরের বুকও ভিজে গেল। কিন্তু বুঝলোনা কেবল মক্কার পাপিষ্ঠ মানুষ।

রাসূল কংকর আর উত্তপ্ত বালুর পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন মদীনায়।

মদীনাবাসীরা প্রিয় নবীর আগমনে ধন্য হয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠলেন–

"তালাআল বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল বিদাঈ
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদাআ লিল্লাহি দাঈ।"

আটই রবিউল আউয়াল।

মদীনা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে উপস্থিত হলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

কুবায় স্থাপন করলেন রাসূল মুসলমানদের প্রথম মসজিদ এবং এই মসজিদেই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো সালাতুল জুমআ।

মদীনাতেই গড়ে তোলেন রাসূল (সা) মসজিদে নববী।

মদীনা হলো– নগর রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র।

এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামী রাষ্ট্র।

কিন্তু ক্ষেপে গেল কাফির মুশরিকরা। পৃথিবীর প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রটি ধ্বংস

www.amarboi.org

করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা।

ফলে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ!.....

মাত্র তিনশ তের জন মুজাহিদ এগিয়ে চললেন বদর প্রান্তর। সেনাপতি– স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা)।

কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার। তবুও আল্লাহর সৈনিকেরা বিজয় লাভ করলেন বদরের যুদ্ধে।

কেবল বদর নয়।

এভাবে রাসূলকে (সা) মোকাবিলা করতে হলো ওহোদ, খন্দক, খাইবার, তাবুক, হোনাইন মূতাসহ– অনেকগুলো যুদ্ধ।

প্রতিটি যুদ্ধই ছিলো সত্য আর মিথ্যার এবং প্রতিটি যুদ্ধেই অসীম সাহসের সাথে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন রাসূলসহ তাঁর সংগ্রামী দুর্ধর্ষ কাফেলা।

এভাবেই জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একদিন [১০ই রমযান, অষ্টম হিজরীতে] রাসূল (সা) বিজয় করলেন মক্কা।

মক্কা বিজয়ের পর।

যারা, যে মক্কাবাসীরা একদিন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছিল নবীর ওপর। তাঁর সাথীদের ওপর। তাদের জন্য নবী মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা।

রাসূলের মহত্ত্বে মক্কাবাসীরা অনুতপ্ত হলো। দলে দলে তারা নবীর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। পাঠ করলো তারা প্রশান্ত হৃদয়ে–

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

মক্কা বিজয়ের পর।

নবী মুহাম্মাদ প্রবেশ করলেন পবিত্র কাবায়। কাবার ভেতর রক্ষিত মূর্তির দিকে ছড়ি উঁচিয়ে রাসূল পাঠ করলেন–

"জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা...।"

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"

www.amarboi.org

তারপর– তারপর বহু ত্যাগ তিতীক্ষা, বহু জিহাদ ও রক্তের বিনিময়ে একদিন রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠা করলেন তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ। শোষণহীন অর্থনীতি। জুলুমহীন রাজনীতি এবং সুন্দর ও সুস্থির একটি পরিবেশ। ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের পরশ পেয়ে হেসে উঠলো মানবতা। হেসে উঠলো সমগ্র পৃথিবী। আর এভাবেই একদিন পূর্ণ হলো মহানবীর (সা) মহান আন্দোলনের এক বিশাল জীবন। ধ্বনিত হলো প্রিয় নবীর (সা) কণ্ঠে মহান রাব্বুল আ'লামীনের সর্বশেষ বাণী–

"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।"

"আজ তোমাদের জন্য আমার দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম। দীন হিসেবে ইসলামকে আমি মনোনীত করলাম।"

www.amarboi.org

বিস্ময়কর বিজয়

কুরাইশদের একটি বিশাল বাণিজ্যিক কাফেলা।

এগিয়ে চলেছে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে।

সংখ্যায় ত্রিশ-চল্লিশ জন।

নেতৃত্বে আছে এক অসাধারণ বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি আবু সুফিয়ান! আসছে সিরিয়ার দিক থেকে।

আবু সুফিয়ান বাণিজ্যিক বহর নিয়ে ফিরছে বহুদিন পরে।

ফিরছে মক্কায়। তার সাথে আছে অঢেল সম্পদ।

কুরাইশরা অপেক্ষায় দিন গুণছে।

আবু সুফিয়ান এতো দেরি করছে কেন? তার দায়িত্বে তাদের ব্যবসার হিসসা। ধন-সম্পদ।

www.amarboi.org

একজন অবিশ্বাসী আর একজন অবিশ্বাসীকে কখনো বিশ্বাস করতে পারেনা। এটা তাদের ভাগ্যের এক চরম লাঞ্ছনা।

কুরাইশদের কেউ কেউ সন্দেহ করলো। তবে কি আবু সুফিয়ান তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার পাঁয়তারা করছে?

অসম্ভব?

কুরাইশদের চোখে-মুখে দুলে উঠলো একখণ্ড সন্দেহের মেঘ।

রাসূল (সা) বসে আছেন। সাহাবা বেষ্টিত।

সবাই তাকিয়ে আছেন দয়ার নবীর দিকে।

তাদের মধ্যে নীরবতার কুয়াশা।

জমাট হয়ে এসেছে হৃদয়ের উসখুস।

সহসা বিজলীর মতো ছড়িয়ে পড়লো নবীজীর ঠোঁটের দ্যুতিময় হীরক।

সাহাবীরা নড়েচড়ে বসলেন। আরও বেশি মগ্ন হলেন তারা। বুঝলেন নবী (সা) কিছু বলবেন।

মুখ খুললেন আলোকের সভাপতি। বললেন, 'আবু সুফিয়ান অঢেল ধন-সম্পদ নিয়ে এখন মরুভূমির মধ্যে, যাও! আল্লাহ হয়তোবা ঐ সম্পদ তোমাদের হস্তগত করে দেবেন।'

কথা শেষ করলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

সাহাবীরা তাকালেন একে অপরের দিকে।

সকলের চোখে-মুখে নির্দেশ পালনের সম্মতির স্মারক। তারা দেরি না করে স্পর্শ করলেন সিদ্ধান্তের পর্বত।

প্রস্তুতির পালা শেষ।

হেজাজের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো আবু সুফিয়ান।

তার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো সন্দেহের আগুন। কাফেলাকে বোধহয় ধাওয়া করছে কোনো শক্তিশালী বাহিনী। চারদিকেই সতর্ক দৃষ্টি। যাকে সামনে পায় তার কাছেই জিজ্ঞেস করে। জানতে চায়, তারা কোনো আক্রমণকারীর খবর জানে কি না।

www.amarboi.org

কেউ পাশ কেটে যায়।

আবার কেউবা বলে ফেলে আবু সুফিয়ানের মুখের ওপর। 'হ্যা, আসছেন মুহাম্মাদের সাথীরা আসছেন। সুতরাং সাবধান।'...

মুহাম্মাদের বাহিনী!

অকস্মাৎ অনড় হয়ে গেল আবু সুফিয়ানের পা।

দুশ্চিন্তার ঘামে ভিজে গেল তার শরীর। উদ্বিগ্ন আর ভয়ে থর থর কম্পমান।

সত্যিই কি তারা আসছে?

আবু সুফিয়ানের মাথায় সহসা আছড়ে পড়লো একখণ্ড আতঙ্কের পাথর।

ভেবে নিল কিছুক্ষণ। তারপর দামদামকে পাঠিয়ে দিল মক্কায়।

'যাও! দ্রুত খবর দাও কুরাইশদের। সাহায্যের ভীষণ প্রয়োজন। আমরা এখন বিপদের মুখোমুখি। বজ্রপাতের মতো যে কোনো সময়ে নামতে পারে আমাদের ওপর গজবের বৃষ্টি। মুহাম্মাদের সাথীরা আসছে। ক্রুদ্ধ ঝড়ের বেগে।'

দলপতির নির্দেশ!

দামদাম ছুটে চললো বিদ্যুৎগতিতে। মক্কার দিকে।

দুই.

গভীর রাত।

চারদিকে নীরব নিস্তব্ধ।

একটা গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে সমগ্র মক্কাকে। ঘুমে আচ্ছন্ন সকল জনপদ। উটগুলো বিশ্রামে জাবর কাটছে। অবিরাম।

হঠাৎ ঘুমের আবরণ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো আতিকা। ভয়ের মৌমাছিরা হুল ফুটাচ্ছে তার কোমল শরীরে। হুলগুলো ভীষণ কষ্টদায়ক। যন্ত্রণায় ছটফট করছে একাকী। অস্থির আতিকা।

ঘামে ভিজে গেছে তার সমগ্র শরীর। দু'হাতে মুখ মুছে আবার শুয়ে পড়লো। ভুলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। ভয়ঙ্কর সেই স্বপ্নটি তার

www.amarboi.org

চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের অবাধ্য তরঙ্গের মতো। বারবার।

নির্ঘুম চোখে ভোরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকলো আতিকা।

প্রভাতের পাখিরা এক সময় ডেকে উঠলো কুরাইশদের ঘরের চালে। প্রতীক্ষার প্রহর শেষ।

আড়মোড়া ভেঙ্গে রাতের দুঃস্বপ্নের ক্লান্তির ভার ঝেড়ে ফেলতে চাইলো আতিকা। কিন্তু ব্যর্থ হলো।

বোনের উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠলো আব্বাসের বুক। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছে আতিকা? রাতে ঘুমাওনি বুঝি? এতো মলিন দেখাচ্ছে কেন তোমার চেহারা?'

স্বপ্নের কথাটি ঠেলে উঠলো আতিকার গলার উপকণ্ঠে। কোনোক্রমেই আর চেপে রাখতে পারলো না সে। বললো, 'ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি ভাই! গতরাতে। বুকটা এখনো ধড়ফড় করছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনে।'

আব্বাসের কণ্ঠে বিস্ময়, 'বলো বোন, কি দুঃস্বপ্ন দেখেছো, আমাকে খুলে বলো। ভারমুক্ত হও। ছুঁড়ে ফেলো বুক থেকে শঙ্কা আর কষ্টের পাথর। জলদি বলো আতিকা!'

কেঁপে উঠলো আতিকার ঠোঁট। বললো, 'কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম, একজন সওয়ার মক্কার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে নেমে এলো। তারপর চিৎকার করে বললো– 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। মাত্র তিন দিন।'

একটু থামলো আতিকা।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলো, 'তারপর দেখলাম, বহু লোক তার পাশে সমবেত হলো। তারা প্রবেশ করলো মসজিদুল হারামে। বীরদর্পে। সবাই যখন তার পাশে জমা হলো তখন দেখলাম, তার উটটি তাকে নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করছে। কাবার ভেতর থেকে লোকটি চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে তোমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। তারপর! তারপর, দেখলাম, তার উটটি তাকে নিয়ে আরোহণ করলো আবু কুবাইশ পর্বত শিখরে। সেই পর্বতের শিখরে

www.amarboi.org

দাঁড়িয়ে সে আবার চিৎকার করে বললো, 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যে তোমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। মাত্র তিন দিন।'

কথা অসমাপ্ত রেখে কয়েকবার দম ছেড়ে নিল আতিকা।

তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। চাবুকের আঘাতের মতো স্পষ্ট। মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'তারপর দেখলাম, সেই পর্বতের শিখর থেকে একটি পাথরের চাঙ ফেলে দিল লোকটি। গড়াতে গড়াতে সেটি পর্বতের পাদদেশে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছিটকে পড়া কাঁচের মতো এবং কি আশ্চর্য! সেই ভয়ঙ্কর পাথরের টুকরোর অংশ মক্কার কুরাইশদের প্রতিটি গৃহে অকস্মাৎ প্রবেশ করলো।

'সর্বনাশ।'

আব্বাসের কণ্ঠ দিয়ে সহসা বেরিয়ে এলো ভয়তাড়িত একটি দীর্ঘশ্বাস। বললো, 'আমি নিশ্চিত। কুরাইশদের ওপর নেমে আসছে একটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের প্লাবন। এই স্বপ্নের কথা তুমি আর কাউকে বলো না, আতিকা।'

'না বলবো না ভাই। তুমিও বলো না কাউকে।'

দু'জনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কিন্তু সময় বড়ো বেরহম।

সময়ের বাতাস বহন করে নিয়ে গেল এই গোপন স্বপ্নটি। মুহূর্তে পৌঁছে গেল কুরাইশদের ঘরে ঘরে। পৌঁছে গেল আবু জেহেলের কাছেও।

ধূর্ত শিয়ালের চেয়েও সতর্ক আবু জেহেল। শকুনের মতো তার ঘ্রাণশক্তি। আর হিংস্রতায় সে হার মানায় বনের বাঘকেও। সেই আবু জেহেল। স্বপ্নের কথাটি শুনার পর ডেকে পাঠালো আব্বাসকে। জিজ্ঞেস করলো স্বপ্নের কথা। কণ্ঠে তার ভর্ৎসনা আর তিরস্কার।

আব্বাস একটু চিন্তা করলো।

তারপর বললো, 'হ্যাঁ। আতিকা– আমার বোন এমনই একটি স্বপ্ন দেখেছে।'

হায়েনার মতো হেসে উঠলো আবু জেহেল।

বললো, 'ঠিক আছে। আমরা তিন দিন অপেক্ষা করবো। যদি আতিকার স্বপ্ন সত্যি হয় তাহলে তো অন্যকথা। আর যদি সত্যি না হয় তাহলে

www.amarboi.org

লিখিতভাবে ঘোষণা দেয়া হবে যে, কুরাইশদের মধ্যে তোমাদের মতো আর কোনো মিথ্যাবাদী পরিবার নেই।'

আবু সুফিয়ানের প্রেরিত দামদাম দুঃসংবাদ নিয়ে তখনও মক্কায় পৌছায়নি।

দামদাম মক্কায় পৌছুবার তিন দিন আগেই স্বপ্নটি দেখেছে আতিকা।

আবু জেহেলের তিরস্কারের বিষে জর্জরিত আব্বাস (রা)।

চিন্তামগ্ন সে। মরুভূমির লু-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তার মগজের ভেতর।

কিন্তু আবু জেহেলকে উচিত জবাব দিতে পারলো না সে। হারিয়ে গেল তার প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিশোধের একটি আলপিন মাথা উঁচু করে তবুও তার অস্তিত্ব প্রকাশ করলো আব্বাসের চোখের ভেতর।

তিন.

তিন দিন পর।

বিষণ্ন এবং উদ্বিগ্ন আবু জেহেল।

অস্থিরতার হু হু বাতাসে কেবলই পাক খাছে।

দ্রুত, খুব দ্রুত মসজিদের দরোজার দিকে ছুটে এলো।

তার চোখে-মুখে শঙ্কার ঢল।

দামদামের চিৎকার ধ্বনিটা যেন তার কানের পর্দা ছিঁড়ে ঢুকে পড়েছে সম্ভাব্য মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে। দামদামের চিৎকারটি যেন তখনো তার বুকে পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। মক্কার মরুভূমিতে উটের পিঠে বসেই দামদাম চিৎকার করে বলে যাচ্ছে,

'হে কুরাইশগণ! মহাবিপদ! তোমাদের ধন-সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে। মুহাম্মাদের বাহিনী তার দলের পিছে ধাওয়া করেছে। তাকে সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে যাও।'

শেষ পর্যন্ত আতিকার স্বপ্নই সত্য হলো?

ভাবছে আবু জেহেল।

কিছুক্ষণ! তারপর সে ডাক দিল কুরাইশদের। প্রস্তুত হতে বললো তাদের। দ্রুত। খুব দ্রুত।

www.amarboi.org

কুরাইশরা প্রস্তুত।

মুহাম্মাদের বাহিনীকে রুখবার জন্যে এক হাজার কুরাইশের এক বিশাল বাহিনী সমরসাজে সজ্জিত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান তাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে।

কুরাইশরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একত্রিত হলো।

দলনেতা আবু জেহেল। উপস্থিত কেউ কেউ শংকিত।

যদি মুহাম্মাদের বাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করে? তাহলে তো পরাজয় এবং মৃত্যু অনিবার্য!

এক অজানা আশঙ্কায় তারা কেউ কেউ দ্বিধান্বিত। তাদের বুকে এসে জমা হলো দোদুল্যমানতার কুয়াশার পর্বত।

যুদ্ধে যাবে কি যাবে না ভাবছে একাংশ।

ধূলোর আস্তরণ ভেদ করে সহসা নড়ে উঠলো ইবলিস।

মানুষের বেশে উপস্থিত হলো সে দ্বিধান্বিত কুরাইশদের মাঝে। তার কণ্ঠে মিথ্যা অভয়। বললো, 'কোনো ভয় নেই। তারা যেন পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে সেটা আমি খেয়াল রাখবো। তোমরা এগিয়ে যাও!'

দ্বিধান্বিত মানুষগুলো এবার বুকটান করে উঠে দাঁড়ালো। ইবলিসের কুপরামর্শে তারা স্বস্তি ফিরে পেল। আবু জেহেলের বুক থেকেও নেমে গেল দুশ্চিন্তার ভারী পাথর।

কুরাইশদের একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা ত্যাগ করলো ইবলিসের জানের দোস্ত– আবু জেহেল।

চার.

রমযান মাস।

রাসূল (সা) প্রস্তুত করলেন তাঁর তিনশত চৌদ্দজনের একটি বাহিনী। উটের সংখ্যা মাত্র সত্তর। সংখ্যায় আবু জেহেলের বাহিনীর চেয়ে নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কি হবে?

www.amarboi.org

রাসূল (সা)-এর একেক জন সাহাবী তো একেকটি ওহুদ পর্বত।

বুকে তাদের সাহসের সমুদ্র।

এই দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন রাসূল (সা)। মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে তুলে দিলেন একটি শাদা পতাকা। আর রাসূল (সা)-এর সামনে রাখলেন আরও দু'টি কালো পতাকা। যার ভেতর একটি পতাকার নাম 'ঈগল'।

রাসূল (সা) চলেছেন তাঁর বাহিনী নিয়ে।

মক্কার পথ ধরে।

মদীনার বাইরের গিরি প্রবেশ পথে পৌঁছুলেন তিনি। যাত্রা বিরতি করলেন রাওহার সাজসাজ কূপের কাছে। একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর আবার যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য বদর প্রান্তর।

কিছুই গোপন থাকলো না শেষ পর্যন্ত।

রাসূল (সা) জেনে গেলেন কুরাইশদের অভিযানের কথা। আবু জেহেলের নেতৃত্বে তারা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে রক্ষার জন্যে। এগিয়ে আসছে তারা যুদ্ধ করার জন্যে।

খবরটি জানিয়ে দিলেন রাসূল (সা) সাথীদেরকে। বললেন, 'কিভাবে মোকাবিলা করা যায়– পরামর্শ দাও।'

খুশি হলেন সকল সাহাবী।

রাসূল (সা) পরামর্শ চাচ্ছেন! তারা বললেন প্রাণ খুলে নিজের কথা। নিঃসঙ্কোচ অভিমত।

মন দিয়ে শুনলেন রাসূল (সা)।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা বেরিয়ে পড়ো। আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান অথবা কুরাইশদের বাহিনী– এ দু'টোর যে কোনো একটি আমাদের হাতে পরাভূত হবে। আল্লাহর কসম, আমি যেন এখনই দেখতে পাচ্ছি কুরাইশদের শোচনীয় মৃত্যু।'

উৎসাহিত হলেন প্রতিটি সত্যের সৈনিক। সাহসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর একবার লাফিয়ে উঠলো তাদের অকম্পিত পাঁজর ফুঁড়ে।

www.amarboi.org

সাথীদের নিয়ে রাসূল (সা) পৌঁছে গেলেন বদরের কাছাকাছি। তাঁবু গাড়লেন তাঁরা রাসূল (সা)-এর নির্দেশে।

পাঁচ.

শংকিত আবু সুফিয়ান।

চারদিকেই সতর্ক দৃষ্টি। তার কাফেলাকে পেছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। জলাশয়ের কাছে দেখতে পেল মুজদি ইবনে আমেরকে। তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এদিকে তেমন কাউকে দেখেছো কি?'

জবাব দিল মুজদি। বললো, 'সন্দেহজনক তেমন কাউকে দেখিনি। তবে দু'জন উট সওয়ার-কে দেখলাম। তারা এই পাহাড়টির কাছে উট থেকে নামলো। তারপর মশকে পানি ভরে আবার চলে গেল ঐ পথে।'

মুহূর্তে কেঁপে উঠলো আবু সুফিয়ানের দুরুদুরু বুকটা। ভাবলো, আক্রমণকারীদের কেউ নয়তো?

সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে জলাশয়ের কাছে।

বিক্ষিপ্তভাবে সেখানে ছড়িয়ে আছে আগন্তুকের উটের গোবর। একমুঠো গোবর হাতে তুলে নিল আবু সুফিয়ান। পরীক্ষা করে দেখলো গভীরভাবে। গোবরের ভেতর দেখতে পেল সে কয়েকটি আঁটি। সাথে সাথে দুশ্চিন্তার পাথরটি সরে গেল তার বুক থেকে। বুঝলো, এই উট ইয়াসরিবের। কেননা, যে খাদ্যের গোবর এটা, তা কেবল ইয়াসরিবের পশুদেরই খাদ্য।

শংকামুক্ত হলো আবু সুফিয়ান। মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবী বাহিনী তাকে নিশ্চয়ই আর আক্রমণ করতে আসছে না!

সে দ্রুতবেগে জলাশয় ত্যাগ করে ফিরে এলো তার কাফেলার কাছে। তারপর বদর প্রান্তর বামে রেখে সমুদ্র কিনার বেয়ে এগিয়ে চললো সুস্থির পদক্ষেপে। মক্কার দিকে।

কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিল আবু সুফিয়ান। জানালো, 'তোমরা তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, তোমাদের লোকজন আর তোমাদের সহায়-সম্পদ মুহাম্মাদের বাহিনী থেকে রক্ষা করার জন্যে এসেছো। তার আর

www.amarboi.org

দরকার নেই। আল্লাহ এগুলোকে রক্ষা করেছেন। অতএব তোমরা ফিরে যাও মক্কায়। আপন গৃহে।'

যথা সময়ে আবু জেহেলের কাছে পৌঁছে গেল আবু সুফিয়ানের বার্তা।

পুলকিত আবু জেহেল।

তার চোখ থেকে যেন সরে গেল অশুভ মেঘের স্তূপ। বললো, 'তবুও আমরা বদরে যাবো। সেখানকার বিখ্যাত মেলায় উপস্থিত হয়ে আনন্দফূর্তি করবো। তিনদিন থাকবো সেখানে। পশু জবাই করবো। মদ খাবো। গায়িকারা বাজনা বাজিয়ে গান গাইবে। আমরা আরবদেরকে আমাদের অভিযানের কথা শুনাবো। শুনাবো বাহিনী গড়ে তোলার অমর কাহিনী। তাদের মনে ভীতির কাঁটা বিধিয়ে দেবো আমরা। অতএব হে সাথীরা, বদরের মেলায় চলো!'

আবু জেহেল তার বাহিনী নিয়ে বদরের একটি দূরবর্তী মরুময় টিলার পাশে তাঁবু ফেললো।

তারা তখন আনন্দে বিভোর।

হৃদয় উপচে পড়ছে খুশির ঢল।

এ সময়ে আল্লাহ বৃষ্টি দিলেন। প্রচুর বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তাঁবুর আশ-পাশ ভিজে একাকার। তবু রাসূল (সা)-এর চলাফেরা করতে মোটেই অসুবিধা হলো না। বরং তাঁদের হৃদয়ে স্পর্শ করলো এক অপার্থিব স্বস্তির পরশ।

আবু জেহেলরা পড়ে গেল মহাসমস্যায়। বৃষ্টির কারণে তাদের চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়লো।

যেখানে বেশি পানি জমা হয়েছে, রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীকে সেখানে নিয়ে গেলেন। হুবাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল (সা)! এই জায়গাটি কি আল্লাহর নির্দেশেই আপনি বেছে নিয়েছেন?'

'না। এটা আমার একটি রণকৌশল মাত্র।' স্মিত হেসে জবাব দিলেন দয়ার নবী (সা)।

হুবাব (রা) বললেন, 'তাহলে আমার পরামর্শ এখানকার চেয়ে একটু কম পানি যেখানে চলুন আমরা সেখানেই তাঁবু গাড়ি।'

www.amarboi.org

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন'?

জবাবে হুবাব (রা) বললেন, 'আমরা তেমন একটি জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলবো। সেখানে চৌবাচ্চায় প্রচুর পানি ভরে রাখবো। প্রচুর পানি পাবো আমরা। কিন্তু তারা পাবে না। পানির সমস্যায় কাতর হয়ে পড়বে আবু জেহেলের দল।'

রাসূল (সা) খুশি হলেন।

হুবাব (রা)-এর অভিমতটি চমৎকার।

তার পরামর্শে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরের তেমনি একটি জায়গায় তাঁবু ফেললেন। তৈরি করা হলো একটি চৌবাচ্চা। পানি ওঠানোর জন্য তাতে একটি পাত্রও রাখা হলো। রাসূল (সা)-এর জন্যে তৈরি করা হলো একটি সুরক্ষিত মঞ্চ।

সেই মঞ্চে অবস্থান করতে থাকলেন সেনাপতি নবী মুহাম্মাদ (সা)

ছয়.

সকালের সূর্য মরুভূমিকে ঘিরে রেখেছে প্রহরীর মতো।

চিকচিক করছে বদরের বালুকণা। পাথরের টুকরোরাও হেসে উঠেছে সূর্যের বিভায়।

আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠলো আবু জেহেলের বাহিনী। বেরিয়ে এলো তারা তাদের তাঁবু থেকে।

কাফেরদের নামতে দেখে রাসূল (সা) ফিরে দাঁড়ালেন আল্লাহর দিকে। বললেন, 'হে রাব্বুল আলামীন! এই সেই কুরাইশরা। যারা গর্ব আর অহংকারের জন্যে আপনার সাথে বিদ্রোহ ও আপনার রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করে আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন তার সময় উপস্থিত। হে আল্লাহ! ওদেরকে আজ সকালেই ধ্বংস করে দিন।'

আবু জেহেলের বাহিনীর মধ্যে দেখা দিল আবার দ্বিধার কুয়াশা। কেউ বললো, 'যুদ্ধ করার দরকার নেই। মুসলিম বাহিনী ক্ষুদ্র হলেও তারা আজ

www.amarboi.org

মরণপণ করে নামবে যুদ্ধের ময়দানে। তাদের একজনকে মারলে তারা আমাদের একজনকে না মেরে ছাড়বে না। ক্ষতিটা আমাদেরই বেশি হবে। সুতরাং এখনো ভেবে দেখার সময় আছে।'

হুংকার দিয়ে উঠলো দস্যু আবু জেহেল! 'না, যুদ্ধই একমাত্র ফায়সালা।'

মুহূর্তেই বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

সরব হয়ে উঠলো তাদের সকল যোদ্ধা।

মুসলিম বাহিনীও প্রস্তুত।

আসওয়াদ ছিলো কুরাইশদের মধ্যে গণ্ডারের মতো চরম এক দৈত্য। বুক ফুলিয়ে বললো সে, 'মুসলমানদের চৌবাচ্চা থেকে আমি পানি পান করবো। কিংবা তা ভেঙ্গে ফেলবো।'

প্রতিজ্ঞায় অটল আসওয়াদ।

এগিয়ে গেল সে বীরদর্পে মুসলমানদের চৌবাচ্চার দিকে।

হামযা ছিলেন প্রস্তুত। তীরের আঘাতে ধরাশায়ী করলেন তিনি শক্তিশালী আসওয়াদকে। বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন আসওয়াদের একটি পা।

তারপরও সে বুক টেনে টেনে এগিয়ে যেতে চাইলো চৌবাচ্চার দিকে। কিন্তু সুযোগ আর দিলেন না দুঃসাহসী হামযা (রা)। এবার তিনি চৌবাচ্চার সীমানার ভেতরেই হত্যা করলেন আসওয়াদকে।

এরপরই ভয়ংকর আকার ধারণ করলো বদর প্রান্তর।

যুদ্ধ চলছে তুমুল বেগে।

হযরত হামযা, আলী, বিলাল, হারেসসহ সকল সাহাবী সাহসের সাথে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে গেলেন।

তাদের চোখ দিয়ে তখন প্রবাহিত হচ্ছে কেবল বারুদ।

ক্ষীপ্রগতিতে চলছে হাতের তরবারি।

যুদ্ধ পরিচালনা করছেন স্বয়ং রাসূল (সা)। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'শত্রুরা তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হটিয়ে দেবে সীমানার বাইরে। মৃত্যুর দিকে।'

www.amarboi.org

রাসূল (সা) অবস্থান করছেন তাঁর মঞ্চে।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ।

তারপর বিনীতভাবে মহান আল্লাহর সমীপে বললেন, 'হে মহান রাব্বুল আ'লামীন! এই মুষ্টিমেয় মুসলমান যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আপনার ইবাদত করার জন্যে আর কেউ থাকবে না।'

রাসূল (সা)-এর প্রার্থনায় কেঁপে উঠলো আল্লাহর আরশ।

মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে তার হাঁক মুহূর্তেই পৌঁছে গেল আল্লাহর দরবারে।

রাসূল (সা) এবার চোখ খুললেন।

প্রশান্ত আর প্রত্যয়দীপ্ত তাঁর চেহারা। আবু বকরকে (রা) ডেকে বললেন, 'সুসংবাদ আছে! আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ঐ দেখ জিবরাঈল একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে হাওয়ার গতিতে ছুটে আসছেন। তার পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে জমে গেছে ধূলোর আস্তরণ।'

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলেন রাসূল (সা)।

তাঁর সাথীদেরকে শুনালেন তিনি অভয়বাণী। বললেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আজ যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করবে এবং শুধু সামনের দিকে এগুতে থাকবে, কোনো অবস্থায় পিছু হটবে না– আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।'

কয়েকটি খুরমা হাতে নিয়ে চিবুচ্ছিলেন উমাইর ইবনু হুমাম।

তাঁর কানে গেল রাসূল (সা)-এর এই ঘোষণা। সাথে সাথে তিনি ফেলে দিলেন হাতের খুরমা এবং মুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালেন সাহসের অজেয় পর্বতের ওপর ভর করে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর।

তারপর!

তারপর প্রাণপণে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। শীতল করলেন তার তৃষিত বুক।

রাসূল (সা) দেখছেন যুদ্ধ ক্ষেত্র।

দেখছেন অগ্নিময় বদর প্রান্তর। তারপর একমুঠো ধূলো নিয়ে এগিয়ে

www.amarboi.org

গেলেন কুরাইশ বাহিনীর দিকে। 'ওদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক'– বলে রাসূল (সা) ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন ধূলোর কুণ্ডলী। তারপর তাঁর বাহিনীকে বললেন রাসূল, 'জোর হামলা চালাও!'

অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজয় ঘটলো কুরাইশদের।

চরমভাবে পরাভূত হলো তারা।

তাদের অনেক বড়ো বড়ো নেতা নিহত হলো মুসলমানদের হাতে। অনেকে হলো বন্দী।

এক সময় থেমে গেল যুদ্ধের ঘনঘটা।

বদর প্রান্তর নীরব নিথর। যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) বললেন, 'নিহতদের মধ্যে আবু জেহেলের লাশ আছে কিনা খুঁজে দেখো ভালো করে।'

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ শুনে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। বললেন, 'হে রাসূল (সা)! আবু জেহেলকে হত্যা করা আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি।'

'সত্যিই?' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন।

আবু জেহেলের মস্তকটি রেখে দিলেন মাসউদ রাসূল (সা)-এর সামনে। বললেন, 'জি, সত্যি। এই দেখুন আবু জেহেলের খণ্ডিত মস্তক।'

ধীরে ধীরে একফালি হাসির রেখা দুলে উঠলো নবীজীর স্বর্ণালী ঠোঁটে। সেই কুসুমিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সাহাবীদের সুদীপ্ত চেহারা।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রক্তাক্ত বদর প্রান্তর।

বদরের বিজয়– মূলত সত্যের বিজয়।

বদরের বিজয় সে এক মহাবিস্ময়কর বিজয়।■

www.amarboi.org

অবাক সেনাপতি

এক.

কুরাইশদের বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।

কিছুতেই ভুলতে পারছেনা তারা বদরের পরাজয়ের গ্লানি। ভাবতে পারছেনা, কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

মাত্র তিনশত চৌদ্দজনের কাছে এক হাজারের এক বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীর পরাজয় তাদেরকে ফেলে দিয়েছে বিস্ময়ের গভীরে। বদরে পরাজয়ের পর বল্লমবিদ্ধ হরিণের মতো কেবল অস্থিরভাবে ছুটতে থাকে দুর্ধর্ষ কুরাইশরা। একটি যন্ত্রণার কাঁটা বিধে গেল তাদের শক্ত পাঁজরে।

অন্ধকার জমাট হয়ে এলো তাদের সামনে।

ইবলিস ভাবলো এইতো উপযুক্ত প্রহর!

www.amarboi.org

অন্ধকারের কালো পর্দা ফুঁড়ে ইবলিস তাদেরকে প্ররোচিত করে তুললো পুনর্বার। তারা ছুটে গেল আবু সুফিয়ানের কাছে। বললো, 'আপনিই আমাদের এখন দলনেতা। বদর যুদ্ধে আমাদের অনেকেই পিতা, সন্তান, ভাই হারিয়েছে। এর প্রতিশোধ না নিলে আমরা ঘুমুতে পারবো না। স্বস্তি নেই আমাদের বুকে। আপনার কাছে আছে আমাদের গোত্রের ব্যবসার সম্পদ। সেগুলো দিয়ে দিন আমাদের। সেসব খরচ করবো যুদ্ধের জন্যে। আমরা পুনর্বার মুখোমুখি হতে চাই মুহাম্মাদের। প্রতিশোধ নিতে চাই আমরা– উত্তম প্রতিশোধ।'

প্রসারিত হয়ে উঠলো আবু সুফিয়ানের কপালের ভাঁজ। তার চোখের পাঁপড়িতে লাফিয়ে উঠলো সম্ভাবনার বিদ্যুৎ। নেতৃত্বের চুম্বকে টেনে নিল তাকে সামনের দিকে। বললো,

'হ্যা। প্রতিশোধই আমাদের একান্ত কাম্য। সুতরাং চলো মদীনার দিকে।'

মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেল কুরাইশদের বিরাট এক বাহিনী। সমরসাজে সজ্জিত তারা। সাথে আছে হিন্দাসহ আরও কয়েকজন মহিলা। তাদের কাজ– যোদ্ধাদেরকে সজীব ও সতেজ রাখা।

এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি কুরাইশদের বুদ্ধিমান ও সাহসী যোদ্ধা আবু সুফিয়ান।

প্রতিশোধের বারুদ বুকে নিয়ে কুরাইশরা যাচ্ছে মদীনার দিকে।

মুহাম্মাদের (সা) মুখোমুখি হতে।

দুই.

সর্বদা উৎকর্ণ থাকে মুহাম্মাদের (সা) কান। তিনি চারপাশে শুনতে পান ফিসফাস আওয়াজ।

কিসের আওয়াজ?

সুদূর থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধবাজ কুরাইশদের অশ্বের খুরধ্বনি।

তাদের উট এবং ঘোড়ারাও প্রস্তুত নয় সত্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে।

পশুগুলোর হ্রেষাধ্বনিতে ভেসে আসছে এক মহাবিদ্রোহের সরব চিৎকার।

www.amarboi.org

যে চিৎকারের ভাষা বুঝতে পারেনা আবু সুফিয়ান।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) বোঝেন। তিনি বুঝতে পারেন কুরাইশদের উট এবং ঘোড়াগুলো তাদেরকে বহন করছে বাধ্য হয়ে। পশুগুলোর হাঁটার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে অনিচ্ছার ত্রুটিপূর্ণ ছন্দগতি।

তবুও তারা আসছে। তারা আসছে কুরাইশদেরকে বহন করে মদীনার দিকে। পশুগুলোর পিঠের ওপর পাপের বোঝা।

তারা এখন বাতনুস সুবখার পাহাড়ের কাছে। অবস্থান করছে সেখানে কুরাইশরা যোদ্ধার ভঙ্গিতে।

রাসূলের (সা) নির্দেশে একত্রিত হলেন তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা। গোল হয়ে বসলেন নক্ষত্রেরা। মাঝখানে প্রদীপ্ত সূর্য– নবী মুহাম্মাদ (সা)।

চারপাশ নীরব-নিস্তব্ধ। তাঁদের চাহনীতে নির্দেশ পালনের সম্মতি।

সহসা বাতাস ছুঁয়ে গেল সকলের মস্তক। নক্ষত্রেরা নড়েচড়ে বসলেন। তাকালেন সূর্যের দিকে। সম্ভবত কিছু বলবেন আলোকের সভাপতি।

রাসূল (সা) তাকালেন সাথীদের দিকে। তাঁর চোখের দ্যুতিতে হীরকের গুঁড়ো। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে অমূল্য বিদ্যুৎ। এবার নড়ে উঠলো তাঁর সুস্থির ঠোঁট। বিশুদ্ধ তাঁর ভাষা। ধীর লয়ে বললেন রাসূল (সা) :

'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।'

সাথীদের চোখে মুখে জিজ্ঞাসার বৃষ্টি।

রাসূল (সা) বুঝলেন সেটা। বললেন, 'দেখলাম, আমার একটি গরু জবাই করা হয়েছে। আর আমার তরবারির ধারালো প্রান্তে যেন ফাটল ধরেছে।'

চমকে উঠলেন সকল সাহাবী। বিস্ময়ে তাকালেন তাঁরা রাসূলের (সা) দিকে।

রাসূল (সা) আবারও বলে চললেন, 'আরও দেখলাম, আমি একটি সুরক্ষিত বর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়েছি। এই বর্ম দ্বারা আমি মদীনাকে বুঝেছি। তোমরা যদি মনে করো মদীনায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশরা যেখানে অবস্থান করছে, সেখানে থাকা কালেই তাদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেবে– তাহলে সেটা করতে পারো। তারপরও যদি তারা ওখানেই অবস্থান

www.amarboi.org

করে তাহলে সেটা হবে তাদের জন্যে খুবই খারাপ অবস্থান। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে মদীনায় বসেই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।'

রাসূলের (সা) উচ্চারণে সাথীরা বুঝতে পারলেন কুরাইশদের অবস্থানের কথা। বুঝতে পারলেন রাসূলের (সা) অভিমতের কথা। তবুও পরামর্শ চাইলেন রাসূল (সা)।

কিছু সাহাবী অভিমত দিলেন তাঁদের বিবেচনার সপক্ষে। বললেন, 'দরকার নেই মদীনার বাইরে যাওয়া। প্রয়োজন হলে আমরা এখানে থেকেই যুদ্ধ করবো কুরাইশদের সাথে।'

উন্মুক্ত পরিবেশ। যে কেউ ব্যক্ত করতে পারেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। বাক স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন না একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

রাসূল (সা) শুনলেন এক পক্ষের কথা। এবার তাকালেন অন্য পক্ষের দিকে।

এতোক্ষণ যারা ছিলেন নীরব শ্রোতা, রাসূলের সম্মতি পেয়ে এবার তাঁরা নড়ে উঠলেন। বললেন, 'হে রাসূল, আমরা চাই মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে। আমাদেরকে বাইরে নিয়ে চলুন। আমরা শত্রুর মোকাবেলা করবো। কুরাইশরা যেন বুঝতে না পারে যে আমরা দুর্বল কিংবা কাপুরুষ হয়ে গেছি।'

মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চান– তাদের সংখ্যা অধিক। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে শ্রদ্ধা জানালেন রাসূল (সা)।

তিনি দ্রুত প্রবেশ করলেন নিজের ঘরে এবং একটু পর বেরিয়ে এলেন যুদ্ধের পোশাক পরে।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন সাহাবীরা রাসূলের (সা) দিকে।

দিনটি ছিলো জুমআর দিন।

রাসূল (সা) নামায আদায় করলেন। তারপর সমবেত মুসলিম জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রণসাজে সজ্জিত সেনাপতি– মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূল (সা) চেয়েছিলেন মদীনায় থেকে কুরাইশদের মোকাবেলা করতে।

www.amarboi.org

কিন্তু সাহাবীদের একাংশ চাইলেন যুদ্ধের জন্যে মদীনার বাইরে যেতে।

যারা পরোক্ষভাবে রাসূলের অভিমতের বিপক্ষে ছিলেন– তারা অনুতপ্ত হলেন। বললেন, 'হে রাসূল (সা), আপনার মতকে পছন্দ না করে আমরা অন্যায় করেছি। আপনি যদি মদীনাতেই অবস্থান করতে চান, তবে তাই করুন।'

স্মিত হেসে উঠলেন রাসূল (সা)। বললেন, 'না। তা আর হয়না। যুদ্ধের পোশাক পরার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোনো নবীর পক্ষে শোভা পায়না।'

সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা)।

নির্দেশ পালনে তৎপর হলেন সকল মুসলিম সৈনিক।

শুরু হলো যুদ্ধাযাত্রা।

এক হাজারের একটি সৈনিক বহর নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চললেন রাসূল (সা)।

ক্রমাগত সম্মুখে।

তাঁরা তখন মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শাওত নামক স্থানে।

এ সময়ে দ্বিধার তরঙ্গে ভেসে উঠলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। সে বললো, 'মদীনার বাইরে আসতে নিষেধ করেছিলাম আমি। রাসূল (সা) আমার কথা শুনলেন না। হে জনতা, আমি বুঝি না আমরা কিসের জন্য এতোগুলো লোক এখানে প্রাণ দেবো?'

যুদ্ধযাত্রা থেকে পিঠটান দিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। একা নয়, সাথে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার গোত্রের অন্যান্য মুনাফিক ও সংশয়মনাদেরকেও।

তারা সংখ্যায় ছিলো মুসলিম সৈন্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এই বিপুল সৈন্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে রাসূলের (সা) দল থেকে। তবুও ভেঙ্গে পড়লেন না সেনাপতি মুহাম্মাদ। বাকী সৈন্য নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন দুর্বার গতিতে।

সামনেই উহুদ।

উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রান্তে মোতায়েন করলেন রাসূল (সা) তাঁর প্রিয় সাথীদের।

www.amarboi.org

দাঁড়ালেন পাহাড়কে পেছনে রেখে এবং ভেসে এলো সেনাপতির নির্দেশ, 'আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না।

তিন.

বেপরোয়া এবং উদভ্রান্ত কুরাইশ বাহিনী। চক্রান্তের অপছায়া তাদের চোখে মুখে।

তাদের উট এবং ঘোড়াগুলোকে তারা ছেড়ে দিল মুসলমানদের পলি বিধৌত ছামগার ফসল সমৃদ্ধ ভূমিতে। অবোধ পশুরা খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে মুসলমানদের স্বপ্নের ফসল।

অদূরে মুসলিম বাহিনী। তারা দেখছেন অবাক বিস্ময়ে।

দেখছেন আর ভাবছেন। কুরাইশদের জঘন্যতম দস্যুপনা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

এগিয়ে এলেন একজন আনসার রাসূলের (সা) কাছে। চোখে তার ক্রোধের বারুদ। চিৎকার করে বললেন, 'অসহ্য! অসহ্য কুরাইশদের এই হীন তৎপরতা! এর জবাব একমাত্র তরবারি!'

রাসূল (সা) সম্মত হলেন।

মুহূর্তে গর্জে উঠলেন মুসলিম সৈন্যরা। সেনাপতির নির্দেশে।

সংখ্যায় তারা মাত্র সাতশ পঞ্চাশ।

প্রতিপক্ষও প্রস্তুত। সংখ্যা তারা তিন হাজার।

এবারও বদরের মতো অসম যুদ্ধ। সংখ্যার দিক দিয়ে কুরাইশরা অনেক বেশি। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের সেনাপতি।

রাসূলও (সা) যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।

দু'টো বর্ম পরে নিলেন সেনাপতি রাসূল (সা)। আর যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে।

পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীও নিযুক্ত করলেন তিনি। আবদুল্লাহ

www.amarboi.org

ইবনে কুবাইরকে করলেন এই বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি। তিনি চিহ্নিত হলেন শাদা কাপড় দ্বারা। রাসূল (সা) তাকে বললেন,

'যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি আর পরাজিত হই, কোনো অবস্থাতেই শত্রুকে পেছন দিক থেকে আসতে দেবেনা। দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার দিক থেকে যেন আমরা আক্রান্ত না হই।'

রাসূলে খোদা (সা) কোষমুক্ত করলেন তাঁর তরবারি। সূর্যের সোনালি কিরণে চকচক করে উঠলো ধাতব অসি। ঝিলিক দিয়ে উঠলো তরবারির সুতীক্ষ্ম ধার।

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, 'কে আছো এমন সাহসী যোদ্ধা, যে এই তরবারির হক আদায় করতে পারো? এগিয়ে এসো।'

অনেকেই এগিয়ে এলেন।

কিন্তু তরবারিটি তাদেরকে দিলেন না রাসূল (সা)।

এবার সাহসী ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন দুঃসাহসী আবু দুজানা। জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল (সা)! এই তরবারির হকটা কি?'

রাসূল (সা) বললেন, 'এই তরবারি দিয়ে এতো বেশি আঘাত করতে হবে যেন তা বাঁকা হয়ে যায়।'

আবু দুজানা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি এই তরবারির হক আদায় করবো। হে রাসূল! তরবারিটি আমাকে দিন।'

আবু দুজানার জবাবে খুশি হলেন সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা)। তরবারিটি দিলেন তিনি হযরত আবু দুজানাকেই।

চার.

যুদ্ধ শুরু হলো পরদিন।

তুমুল যুদ্ধ!

যুদ্ধের তাণ্ডবে ভারী হয়ে উঠলো উহুদের উত্তপ্ত বাতাস। পাখিরা কম্পমান। পাহাড়গুলো টালমাটাল।

যুদ্ধ চলছে।

www.amarboi.org

উহুদের যুদ্ধ!

আবু দুজানা রাসূলকে (সা) দেয়া অঙ্গীকার পূরণে তৎপর। তরবারির হক আদায় করে চলেছেন তিনি। প্রতিপক্ষরা দাঁড়াতে পারেনা আবু দুজানার তরবারির সামনে। শত্রুপক্ষের যাকে পান, তাকেই হত্যা করেন তিনি। এক সময় তাঁর তরবারির সামনে পড়লো পাপিষ্ঠা হিন্দা। নড়ে উঠলো আবু দুজানার তরবারি। কিন্তু না, রাসূলের তরবারি দিয়ে তিনি একজন নারীকে হত্যা করা ঠিক মনে করলেন না। ভাবলেন, তাতে অপমান করা হবে এই তরবারির। আবু দুজানা ছেড়ে দিলেন হিন্দাকে।

ওদিকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন দুঃসাহসী হামযা। তিনি হত্যা করে চলেছেন প্রতিপক্ষ শত্রুকে। হত্যা করলেন কাফেরদের পতাকাবাহী

– আরতাহ ইবনে আবদ শুরাহবীলকে।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে যাচ্ছেন অসীম সাহসী হামযা।

যুদ্ধ করতে করতে ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর সমগ্র শরীর। রক্তাক্ত তরবারি। ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন হামযা। ক্রমাগত সামনে। ওঁৎ পেতে বসে ছিলো কুরাইশ গোলাম– ওয়াহশী। শর্ত ছিলো, যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে তবে তাকে তারা মুক্তি দেবে।

সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো ওয়াহশী।

যখন সুযোগ পেল তখন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে হামযাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলো ওয়াহশী। বর্শাটি বিধে গেল হামযার তলপেটে। তবুও তিনি চেষ্টা করলেন উঠতে। কিন্তু পারলেন না।

একটু পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো এক মহান সৈনিক– হামযার দেহ।

শহীদ হলেন তিনি।

মু'সআব ইবনে উমাইর। রাসূলের (সা) নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শহীদ হলেন।

মু'সআব ইবনে উমাইর শহীদ হলে পতাকা তুলে দিলেন রাসূল (সা) শেরে খোদা আলীর হাতে।

পতাকা হাতে নিয়ে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুঃসাহসী আলী

www.amarboi.org

যুদ্ধের ময়দানে।

উহুদের যুদ্ধ আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করলে হযরত আলী চিৎকার করে বললেন, 'কে আছো, এসো! আমি বিভীষিকার বাবা!'

এভাবে জ্বলে উঠলেন সাহসের আগ্নেয়গিরি– হযরত আলী।

আলীর হুংকার শুনে এগিয়ে এলো কুরাইশদের একযোদ্ধা– আবু সাদ। যে বলেছিল, 'আমি বিভীষিকা সৃষ্টিকারী।' শক্তিশালী যোদ্ধা হযরত আলী। তিনি মুহূর্তেই হত্যা করলেন 'বিভীষিকা সৃষ্টিকারী' আবু সাদকে।

আসিম ইবনে আবুল আকলাহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে হত্যা করলেন মূসাকে এবং তার ভাই জুলাস ইবনে তালহাকে।

তাদের মা হত্যাকারীর নাম জানার পর বললো,

'আসিম ইবনে আকলাহকে যদি কেউ হত্যা করতে পারে, তবে আমি তার মাথার খুলিতে মদ পান করাবো।'

মুসলিম বাহিনীর আর এক দুঃসাহসী যোদ্ধা হযরত হানজালা। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হলেন। তাঁর জন্যে গোসল ছিলো অপরিহার্য। ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিলেন পরম শ্রদ্ধায়।

মুসলিম বাহিনীর হামযাসহ বেশ কয়েকজন বড়ো বড়ো যোদ্ধা শহীদ হলেন উহুদের ময়দানে।

কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের মুখোমুখি।

প্রতিপক্ষের বহু যোদ্ধা নিহত হলো। চরমভাবে পরাভূত হলো আবু সুফিয়ানের বাহিনী।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপর।–

তারপরই উহুদের প্রান্তরে ঘটে গেল অন্য এক করুণ দৃশ্য।

পাঁচ.

যুদ্ধের বিজয়টা যখন মুসলমানদের হাতের মুঠোয় তখনই নেমে এলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়। কুরাইশরা প্রাণভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাচ্ছে উর্ধ্বশ্বাসে।

www.amarboi.org

তীরন্দাজ বাহিনী তা দেখে বেখেয়াল হয়ে ধাওয়া করলেন পলায়নরত কুরাইশদের পেছনে। তাদের পেছনের গিরিপথটি রয়ে গেল সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

সেনাপতি রাসূলের (সা) নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলিম বাহিনী নতুন করে আক্রান্ত হলেন পেছন দিক থেকে।

প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে যে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সুযোগ পেয়ে তারা আবার সংঘবদ্ধ হলো। জোর হামলা চালালো তারা বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের ওপর।

এই বিচ্ছিন্নতার কারণে শহীদ হলেন বেশ কিছু মুসলিম সৈনিক।

অকস্মাৎ ভেসে এলো এক প্রলয়ংকরী শব্দ– 'মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছেন!'...

শব্দটি শোনার সাথে সাথে বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈনিকরা পুনরায় একত্রিত হলেন।

ক্রমশ উহুদ হয়ে উঠলো মুসলমানদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষার প্রান্তর। ভয়াবহ ময়দান।

মুসলিম সৈনিকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও আর পরাভূত করতে পারছেন না কাফেরদের।

একটু একটু করে কাফেররা অগ্রসর হচ্ছে।

অগ্রসর হতে হতে এক সময় তারা প্রায় পৌঁছে গেল রাসূলের কাছাকাছি। তাদের হাত থেকে ছুড়ে মারা পাথরের আঘাতে ভেঙ্গে গেল রাসূলের (সা) একটি দাঁত।

রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল।

কপাল জখম হয়ে ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল রাসূলের (সা) পবিত্র রক্ত।

ইবনে কুময়া আঘাত করলো রাসূলের (সা) চোয়ালের উপরিভাগে। মুহূর্তে তাঁর শিরোস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে ঢুকে গেল রাসূলের (সা) চোয়ালের ভেতর।

www.amarboi.org

রক্তে রঞ্জিত রাসূলের (সা) মুখমণ্ডল।

রাসূলের (সা) শরীরের রক্ত প্রবাহকে সইতে পারলেন না মালিক ইবনে সিনান। তিনি চুষে নিলেন প্রিয় নবীর (সা) মুখের পবিত্র খুন। চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো রাসূলকে (সা) কাফের বাহিনী।

রাসূল (সা) বললেন, 'এমন কে আছো যে আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারবে? জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত আছো কে? এগিয়ে এসো।'

সেনাপতির নির্দেশে উঠে দাঁড়ালেন যিয়াদ ইবনে সিকানসহ পাঁচজন দুঃসাহসী আনসার। বললেন,

'আমরা প্রস্তুত আছি। প্রস্তুত আছি জীবন কুরবানী দিতে হে রাসূল!'

তাঁরা এগিয়ে গেলেন প্রতিরক্ষার জন্যে এবং একে একে তাঁরা প্রত্যেকেই শহীদের পিয়ালা পান করে জুড়াতে থাকলেন তাদের হৃদয়ের অদম্য পিপাসা।

এবার এগিয়ে এলেন অসীম সাহসী বীর– আবু দুজানা। নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে তিনি রক্ষা করতে থাকলেন রাসূলকে (সা)। একের পর এক কাফেরদের তীর এসে বিঁধে যাচ্ছিল আবু দুজানার পিঠের ওপর। আর তিনি অকাতরে রাসূলকে (সা) আড়াল করে, ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন পর্বতের মতো। নবীকে (সা) রক্ষার জন্যে আবু দুজানার পিঠে অসংখ্য তীরের ফলা বিঁধে গেল। তবু তিনি কাফেরদের নিক্ষিপ্ত একটি তীরও বিদ্ধ হতে দিলেন না রাসূলের (সা) পবিত্র শরীরে।

ছয়.

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন রাসূল (সা)। দেখলেন, চারপাশ ঘিরে আছেন নক্ষত্রেরা– আবু বকর, উমর, আলীসহ অনেকেই। বিধ্বস্ত তাঁদের চেহারা। কিন্তু চোখে মুখে সাহস এবং প্রত্যয়ের বিদ্যুৎ।

পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে রাসূল (সা) নিজে বেরুলেন হামযার খোঁজে।

হামযার বিকৃত দেহকে পেলেন তিনি প্রান্তরের মাঝখানে। দেখলেন,

www.amarboi.org

হামযার পেট চিরে কলিজা বের করা হয়েছে। তার নাক কান কেটে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে।

হামযার এই বীভৎস দৃশ্য দেখে কেঁদে উঠলো রাসূলের (সা) কোমল হৃদয়।

হামযা শুধু একজন দুঃসাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) চাচা। সেই প্রাণাধিক চাচার ওপর কাফেরদের পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখে শিউরে উঠলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

হযরত হামযাসহ মুসলিম বাহিনীর শহীদদের লাশ বিকৃত করেছিল হিন্দা এবং তার সহচরীরা।

হিন্দা নিজে হামযার কলিজা টেনে বের করে তা চিবালো। কিন্তু গিলতে পারলো না সে। এই মহিলাই সেদিন শহীদদের নাক কান কেটে তা দিয়ে পায়ের খারু, গলার মালা এবং দুল বানিয়েছিল।

সাত.

উহুদ যুদ্ধ!

উহুদ যুদ্ধ ছিলো এক ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার যুদ্ধ!

উহুদ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ– মুমিন এবং মুনাফিকের মাঝখানে সনাক্তযোগ্য দেয়াল তুলে দিলেন। যারা মুখে ঈমানের দাবি করতো এবং মনেপ্রাণে সুবিধাবাদী ছিল, যারা গোপনে গোপনে কুফরীকে সমর্থন করতো– উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা সবাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ পাক যাদেরকে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন, এই দিনে তারা শাহাদাতের মর্যাদায় হলেন অভিষিক্ত।

উহুদ যুদ্ধ!

হক এবং বাতিলের যুদ্ধ। মুসলমান আর কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ।

উহুদ যুদ্ধ!

ঈমানের চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষার যুদ্ধ।

www.amarboi.org

আট.

নবী মুহাম্মাদ (সা)।

মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিক্ষব্ধ তরঙ্গের বিপরীতে এক দুঃসাহসী পর্বত।

ছিলেন আশ্চর্য এক রণকৌশলী।

যার রণকৌশলের কারণে, নেতৃত্বের নিপুণতায় উহুদের প্রান্তরে সুসজ্জিত বিশাল কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যরা পৌঁছুতে পেরেছিলেন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

নবী মুহাম্মাদ (সা)!

অবাক সেনাপতি!■

www.amarboi.org

যে পরশে জেগেছে প্রাণ

ছেলেটির বয়স মাত্র দশ বছর। যেমন তার স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দরের আলোয় উজ্জ্বল তার চেহারা।

টগবগে এক বালক।

মদীনার ঘরে ঘরে এখন চলছে এক অন্যরকম উৎসবের আয়োজন। রাস্তাঘাটেও তার ঢল নেমেছে। ব্যাপার কী? উৎসুক বালক। চেয়ে থাকে বড়দের হাসি খুশি ভরা মুখের দিকে। জানার চেষ্টা করে উৎসবের কারণ।

এক সময় জানতে পারে।– জানতে পারে আসছেন, আসছেন আলোকের সভাপতি, ধবল জোছনার সম্রাট-মহানবী (সা)।

তিনি আসছেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়! তাঁরই জন্য উদগ্রীব মদীনাবাসী।

www.amarboi.org

তাঁরই জন্য পুলকিত মদীনার আকাশ-বাতাস। বৃক্ষতরু, খেজুর বাগান, পাহাড়-পর্বত এবং মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকণা।

গোটা পরিবেশ যখন উৎসবমুখর, তখন তাতে যোগ দিয়েছে ছোটরাও।

দলে দলে ছোট্ট কচিপ্রাণ– সোনামুখ ছেলেমেয়েরা আনন্দে বিভোর। গান গাচ্ছে বুলবুলির মতো পথে পথে জটলা পাকিয়ে। দল বেঁধে। ছোট্ট বালকটিও আর স্থির থাকতে পারলো না।

সেও সমানে পুলকিত। শিহরিত।

ভাবছে বালক। কেবলই ভাবছে–

আহ! কী সৌভাগ্য আমাদের! কী সৌভাগ্য মদীনাবাসীর! রাসূল (সা) আসছেন!

তিনি আসছেন আমাদের মাঝে! এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে!

এক সময় এলেন তিনি।– মদীনার রাস্তায় পা রাখলেন দয়ার নবীজী (সা)। তখনকার দৃশ্য তো আর ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়!

কী যে আনন্দ ও আবেগঘন মদীনার প্রতিটি প্রান্তর!

ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গানের সুরে সুরে সাদর স্বাগত জানাচ্ছে নবীকে (সা)। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে দশ বছরের বালকটিও। সবার কণ্ঠেই মিষ্টি-মধুর সুর ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে ক্রমাগত বাতাসের পর্দা ফাঁক করে দূরে, বহু দূরে– 'তালাআল বাদরু আলাইনা...'

মদীনার কে না জানে, রাসূল (সা) তাদের মাঝে এসেছেন! তবুও আবেগের বাতাসে দোল খেতে খেতে ছোটরা গানের সুরে সুরে মদীনার প্রতিটি গৃহে গৃহে পৌঁছে দিচ্ছে রাসূলের আগমনের আনন্দবার্তা।

রাসূল (সা) মদীনায় পা রাখতেই মুহূর্তেই সজীব হয়ে উঠলো গোটা মদীনা।

যেন প্রাণ ফিরে পেল মদীনা। এ যেন বহু প্রতীক্ষার পর স্বস্তির বৃষ্টি! রাসূলের (সা) চারপাশে মানুষের ঢল। সে ঢল বন্যার চেয়েও প্রবল। এক সময় ভিড় কমে এলো।

রাসূলও (সা) একটু সময় নিয়ে স্থির হলেন। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঠিক এমনি এক চমৎকার সময়ে রাসূলের (সা) কাছে এলেন একজন মহিলা। এক হাতে ধরে রেখেছেন একটি বালককে।

www.amarboi.org

বড় আদরে। বড় মমতায়। রাসূল (সা) বুঝলেন, ইনিই বালকটির মা। এবার মা ধীরে, খুব ধীরে রাসূলকে (সা) বললেন, হে দয়ার নবী (সা)! আপনি মদীনায় আসার সাথে সাথেই আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছে।

আমি গরিব, অত্যন্ত গরিব মানুষ। আপনাকে কী আর দেবো! কিন্তু আপনাকে একটা কিছু উপহার দেয়ার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। মনের ভেতর উথাল-পাতাল ঢেউ বয়ে চলেছে। আপনাকে দেয়ার মতো কোনো বিষয়-সম্পত্তি নেই আমার। আছে কেবল আমার কলিজার টুকরো, নয়নের মনি ছেলেটি। নিন, নিন দয়ার নবী (সা)! তাকেই আপনার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিচ্ছি। ছেলেটি লিখতে পারে। আপনার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। একে গ্রহণ করুন, তাহলে আমার তৃষিত বুকটাও শান্ত হবে।

এ এক বিরল উপহার!

অসামান্য উপহার! যে উপহারের কোনো তুলনা হয় না। রাসূল (সা) খুশি হয়ে বালটিকে কাছে টেনে নিলেন। আদর করলেন।

তারপর।–

তারপর থেকেই বালকটি রয়ে গেল রাসূলের (সা) কাছে। রাসূলের (সা) একান্ত সান্নিধ্যেই সময়, দিন ও কাল কাটে বালকটির।

রাসূলের (সা) একান্ত কাছে-পিঠে থাকতে পেরে সেও দারুণ খুশি!

যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে। যেন মহাসাগর পেয়েছে। পেয়ে গেছে পৃথিবীর তাবৎ মহামূল্যবান সম্পদ। তার খুশির কোনো সীমা নেই। দিন যায়। মাস যায়। বছরও যায়। রাসূলের (সা) কাছেই আছে সে। রাসূলের (সা) সকল প্রয়োজনেই আছে সে। রাসূলের (সা) খেদমতেই নিয়োজিত রেখেছে নিজেকে। এভাবেই তো কেটে গেল একে একে দশটি বছর!

বালক থেকে কিশোর। কিশোর থেকে এখন সে দুরন্ত এক যুবক। তার কণ্ঠেই একদিন শোনা গেল : 'আমি দশ বছর যাবৎ একাধারে রাসূলকে (সা) খেদমত করেছি। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোনো দিন কিংবা কখনোই রাসূল (সা) আমাকে মারেননি। গালি দেননি। বকাঝকা করেননি। এমনকি মুখ কালোও করেননি!

www.amarboi.org

রাসূল (সা) আমাকে নিয়েই, সেই প্রথম দিন যে কথাটি বলেছিলেন সেটি হলো–

'তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তাহলেই তুমি ঈমানদার হবে।'

আমি রাসূলের (সা) এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। অন্য কারো কাছে তো দূরে থাক, আমার মাকে পর্যন্তও কখনো রাসূলের (সা) গোপন কথা বলিনি।'

রাসূলও (সা) তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করতেন।

তাকে অনেক, অনেক বেশি আদর ও স্নেহ করতেন।

একবার রাসূল (সা) তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন– 'হে আল্লাহ! তার ধন সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান করুন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।'

রাসূলের (সা) দোয়া বলে কথা!

রাসূলের (সা) প্রতিটি দোয়াই আল্লাহ পাক কবুল করেছেন।

একদিনের সেই বালকটি বড় হয়ে রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে থেকে নিজেকেও গড়ে তুলেছিলেন একজন যোগ্য মুমিন হিসেবে। যার মধ্যে ছিলো ঈমান, আল্লাহভীতি, রাসূলপ্রেম, সাহস, দক্ষতা, ক্ষীপ্রতা, নমনীয়তা, ভদ্রতা, কোমলতা এবং ধৈর্যের অসীম গুণ।

রাসূলের (সা) কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন সকল আদব-কায়দা, সুন্দর আচরণ। 'উত্তম নৈতিকতা জান্নাতের কাজ'– রাসূলের (সা) এই কথা, তিনি সকল সময় মেনে চলতেন। আর এ জন্যই তো তিনি পরিশেষে পরিণত হয়েছিলেন সোনার মানুষে।

এই বিরল সৌভাগ্যবান জান্নাতি আবাবিলের নাম– আনাস, আনাস ইবনে মালিক (রা)।

রাসূলের (সা) পরশে তার জেগেছিল প্রাণ। সফল এবং মহৎ হয়েছিল জীবন। তাঁর মতো এমনি ভাগ্য, এমনি জীবন– সে যে আমাদের জন্য বড় কামনার! বড়ই লোভনীয়!■

www.amarboi.org

আলোর মিছিলে

কবি লাবিদ! আরবের বিখ্যাত কবিকুলের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। গোটা আরব জুড়ে বইছে তার সুখ্যাতির সুবাতাস। আরববাসীর মুখে মুখে তার নাম। প্রতি মুহূর্ত উচ্চারিত হয় তার কবিতার পঙক্তি।

সেই বিখ্যাত কবি লাবিদ।–

তখনও আঁধার ফুঁড়ে আলো আসেনি তার সামনে। সময়টা যে জাহেলি যুগ! কিন্তু সত্য সন্ধানী লাবিদ। তিনি প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন। ঠিক একজন কবির মতোই। আর ভাবতে থাকেন। ভাবতে থাকেন একূল-দু'কূল। এতো খ্যাতি, এতো নামডাক– তাতেও কবির মন ভরে না। বরং কী এক তৃষ্ণার যাতনায় তিনি কেবল সারাক্ষণই তড়পান।

কী সেই তৃষ্ণা? কী সেই যাতনা? সে কেবল আলো আর আলোর

www.amarboi.org

তৃষ্ণা। তার আলো চাই। সত্যের আলো। যে আলোতে আলোকিত হতে পারেন কবি ও তার কবিতা! লাবিদ তখন কবি খ্যাতির উচ্চাসনে আরোহণ করছেন।

প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে তখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপে পরিচিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় তার কাছে ইসলামের আহ্বানে পৌঁছে।

সত্যের আহ্বান আসার সাথে সাথে প্রায় শতবর্ষ বয়সী কবি লাবিদ তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করেন। রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হন।

সেখানে পৌঁছে তিনি আল কুরআনের এই সমস্ত আয়াতের আবৃত্তি মন দিয়ে শোনেন।– "তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ কিনেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করলো, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন আর তাদের ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ থেকে মুষলধারে বারি বর্ষণের মতো যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। তারা বজ্রধ্বনি শুনে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙুল, ঢোকায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেন। যাতে তোমরা সংযমী হও।" (সূরা আল বাকারা : ১৬-২১)

www.amarboi.org

লাবিদ ভাবেন, একি! এ যে কবিতার চেয়েও সুন্দর। শিল্পের চেয়েও বড় শিল্প!

আল কুরআনের এই অনুপম ভাষা, অপূর্ব আলঙ্কারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবিদকে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে তখনই তিনি রাসূলের (সা) কাছে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

আমাদেরও ভেবে দেখা দরকার যে, কিভাবে লাবিদ (রা)-এর মতো একজন উঁচুমানের খ্যাতিমান কবিও আল কুরআনের সম্মোহনী শক্তিবলে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন!

কিভাবে রাসূলের (সা) অনুপম আকর্ষণে তিনি মুগ্ধ হলেন!

লাবিদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইসলাম গ্রহণের পর পুলকিত লাবিদ।

তিনি সমান শিহরিত ও আনন্দিত।

তিনি সন্ধান পেলেন এমন এক রত্নসম্ভারের, যার তুল্যমূল্য হিসাবের বাইরে।

কী অসীম পাওয়া!

একেবারেই আসমানের চাঁদ যেন!–

লাবিদ রাসূলকে (সা) পেয়ে গেলেন কাছে, খুবই কাছে। আপন করে।

পেয়ে গেলেন আল কুরআনের সম্মোহনী জাদুর স্পর্শ!

আর ইসলামের ছায়াতলে যিনি আশ্রয় নেন, মহান রব তার সাথেই তো থাকেন।

একই সাথে এতো প্রাপ্তি!–

আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কবি লাবিদ।

দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে তার আরব সাগরের উচ্ছল ঢেউ।

www.amarboi.org

মুহূর্তেই বদলে যান কবি। বদলে যায় তার কবিতার ধারাও।

যে হাত দিয়ে তিনি আগে লিখতেন শুধু আশাহত, স্বপ্নভঙ্গ, বিষাদ-বেদনা কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রেমের কবিতা– সেই হাতেই এবার লিখতে থাকলেন আলো আর আলোর কবিতা।...

রাসূল (সা) কবিতা পছন্দ করতেন। ভালোবাসতেন কবিকেও। রাসূলের (সা) সেই ভালোবাসার অতি প্রিয় কবিদের দলে যুক্ত হলেন আর এক বিখ্যাত কবি লাবিদ। ফিরে এলেন গাঢ়তর অন্ধকার থেকে জোছনা প্লাবিত এক আশ্চর্য সুন্দর জীবনে। শামিল হয়ে গেলেন প্রখ্যাত কবি লাবিদ আলোর মিছিলে। কী সৌভাগ্যবান কবি! ■

www.amarboi.org

খেয়া প্রকাশনী